(ভৌতিক উপন্যাস)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রাপ্তিস্থান
ইস্টার্ণ-ল-হাউস
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ * * * দোলপূর্ণিমা ১৩৪৫

মূল্য বারো আনা

আরতি এজেন্সি, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে শ্রীঅনাথনাথ
দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ২৫৯ নং অপার চিৎপুর রোডস্থ
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমথনাথ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সুরসিক ও সুলেখক সুহৃদ

শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত (ব্যারিষ্টার-অ্যা

করকমলেষু

আমাদের প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

জনশূন্য আলিনগর

সন্ধ্যার আগেই পৃথিবী আজ অন্ধকার হবে! পশ্চিমের আকাশে এখনো খানিকটা জায়গা জুড়ে অস্তগত সূর্য্যের বুকের-রক্ত-মাখানো আলো ছড়ানো আছে বটে, কিন্তু তার শিখা তাড়াতাড়ি নিবিয়ে দেবার জন্যে হু-হু ক'রে বিরাট এক কালো মেঘ ধেয়ে আসছে!

চারিদিকে ছোট-বড় পাহাড় আর বনজঙ্গল। মাঝখানের উঁচু-নীচু পথ দিয়ে একখানা মোটরগাড়ী ছুটে আসছে ঊর্দ্ধশ্বাসে।

গাড়ীর ভিতরে ব'সে রয়েছে তিনজন যুবক ও একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে। যুবকদের পরোণে খাকী সার্ট ও প্যান্ট্ এবং প্রত্যেকেরই হাতে একটি ক'রে বন্দুক।

এ-অঞ্চলের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেনের পুত্র অমিয় আজ তার তিন অতিথি-বন্ধুর সঙ্গে পাখী-শিকারে বেরিয়েছে। তার বোন শীলাও আবদার

রে তাদের সঙ্গে এসেছে। সারাদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে এখন তারা
ড়ী ফিরছে।

অমিয়ের বন্ধু পরেশ বললে, "অমি, গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না।
ড় উঠল ব'লে! কাছে কোথাও লোকালয় নেই।"

অমিয় গাড়ী চালাচ্ছিল। সে জবাব না দিয়ে গাড়ীর গতি
াড়িয়ে দিলে।

নিশীথ বললে, "অমি, যতই 'স্পীড্' বাড়াও, আজ্‌কের এই ঝড়কে তুমি
ছুতেই হারাতে পারবে না। ঐ দেখ, আকাশের শেষ-আলোও নিবে গেল!"

শীলা আমোদ-ভরে গাড়ীর গদীর উপরে ব'সে ব'সেই নেচে উঠে
ললে, "ওহো, কী মজা! বন-জঙ্গলের ভিতরে থেকে আমি কখনো
ড় দেখি নি! ভাগ্যিস্ আজ দাদার সঙ্গে এসেছি!"

পরেশ ও নিশীথ হাসিমুখে শীলার দিকে তাকালে। বনে-জঙ্গলে
ড় যে কি ভয়ানক, শীলা যদি তা জান্ত!

অমিয় বললে, "পরেশ, আর ঝড়কে এড়াবার চেষ্টা করা মিছে!
ঐ দেখ, মাঠের ওপারের গাছপালাগুলো ঝাঁপাই ঝুড়ে দিয়েছে!"

কালো আকাশে বজ্র-বিদ্যুতের অভিনয় আরম্ভ হ'ল! শূন্যে মেঘপুঞ্জের
তলায় দূরে এক তীব্রগতি ধূলোর মেঘ জেগে উঠল! এবং তফাৎ থেকেই
শোনা গেল, বাতাসের মধ্যে ফুটল কেমন এক অশান্ত প্রলাপ!

নিশীথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে বললে, "দূরে লোকালয়ের
মত কি দেখা যাচ্ছে না?"

অমিয় এ-অঞ্চলের পথ-ঘাটের খবর রাখত। সে বললে, "আমি
ঐদিকেই যাচ্ছি। ওখানে আলয় আছে বটে, কিন্তু লোক নেই।

পরেশ বললে, "তার মানে ?"

—"ওটা ছোট একটা সহর। অনেক দিন আগে মড়কে ওখানকার বেশীর-ভাগ লোকই মারা পড়ে—বাকি সবাই পালিয়ে যায়, আর ফিরে আসে নি। ওর নাম আলিনগর। ওখানে এখন জনশূন্য পোড়ো ভাঙা বাড়ী আব ধ্বংসস্তূপ ছাড়া অন্য কিছুই নেই। তবে ওরই মধ্যে কোনখানে হয়তো মাথা গুঁজে আজকের মত ঝড়কে ফাঁকি দিতে পারব।"

পবেশ ও নিশীথ খুসি হয়ে বললে, "ব্যাস্, ব্যাস, অল্‌রাইট!"

শীলা কিন্তু কেমন যেন কুঁক্‌ড়ে প'ড়ে বললে, "ও দাদা, এই অন্ধকারে আলিনগবে গিয়ে কাজ নেই! তার চেয়ে মাঠে ঝড়ের ধাক্কা খাওয়া ভালো।"

অমিয় বিস্মিত স্ববে বললে, "কেন রে শীলা, আলিনগরে যেতে তোর আপত্তি কিসেব ?"

শীলা বললে, "আমাদেব বাবুর্চ্চির মুখে শুনেচি, আলিনগবে এখন যারা থাকে, তারা মানুষ নয়!"

—"মানুষ নয় ? তুই কি বাঘ, ভালুক, হায়েনার কথা বল্‌চিস্ ?"

—"না দাদা, না! তারা নাকি মানুষেব মত দেখতে, কিন্তু তারা মানুষ নয়! শুনেচি, তারা দিনে কবরে শুয়ে ঘুমোয়, রাতে বেরিয়ে এসে বেড়িয়ে বেড়ায়!"

তিন বন্ধুতে একসঙ্গে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। এই একেলে মানুষগুলির কাণে সেকেলে ভূতেব কথা ঠাট্টা-তামাসা ছাড়া আর-কিছুই নয়। আজ্‌গুবি ভূতের গল্প শুনে বড়-জোর সকৌতুকে সময় কাটানো

বলে, কিন্তু তা বিশ্বাস করবে খালি খোকা খুকি আর মূর্খরা! অতএব অমিয় বললে, "তুই কি ভূতের কথা বলচিস্? ছিঃ শীলা, এখনো তোর ও-সব কুসংস্কার আছে?"

কিন্তু শীলা জবাব দেবার আগেই ঝোড়ো হাওয়া পাগলের মত হুঙ্কার দিয়ে তাদের উপরে লাফিয়ে পড়ল। প্রথম আক্রমণেই সে নিশীথের মাথা থেকে টুপী এবং শীলার হাত থেকে রুমাল কেড়ে নিয়ে ধূলায় ধূলায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন ক'রে দিলে! অন্ধকার আকাশে বাজ্ চ্যাঁচাতে লাগল হেঁড়ে গলা ফাটিয়ে এবং এখানে-ওখানে মড়্-মড়্ ক'রে দু-তিনটে গাছ ভেঙে পড়ল! এক মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর রূপ গেল বদ্‌লে!

তীক্ষ্ণ ধূলাবৃষ্টির মধ্যে অনেক কষ্টে চোখ কুঁচ্‌কে তাকিয়ে অমিয় 'হেডলাইট' জ্বেলে দেখ্‌লে, খানিক তফাতেই ভাঙা মস্‌জিদের মত একখানা সাদা বাড়ী দেখা যাচ্ছে!

তীরের মত গাড়ী ছুটিয়ে সেইখানে গিয়ে থেমে প'ড়ে অমিয় বললে, "পরেশ, নিশীথ! শীলাকে নিয়ে শীগ্‌গির নেমে পড়! ঐ মস্‌জিদে গিয়ে ঢোকো!"

মস্‌জিদের একদিক ভেঙে পড়েছে, কিন্তু আর-একটা অংশ তখনো কোন গতিকে দাঁড়িয়ে আছে। সকলে তাড়াতাড়ি সেই অংশে গিয়েই আশ্রয় নিলে।

বাইরে তখন যে কাণ্ড হচ্ছে, ভাষায় তা বুঝানো যায় না! কষ্টি-পাথরের মত কালো নিরেট্ অন্ধকারে পৃথিবীকে কাণা ক'রে ক্ষ্যাপা ঝড় আজ যেন বিশ্ব লুণ্ঠন করতে চায়! দিকে দিকে বিদ্যুতের শত শত আগুন-সাপ লেলিয়ে দিয়ে, বজ্রভেরীতে মৃত্যু-রাগ পূর্ণ ক'রে এবং

অরণ্যের যন্ত্রণা-ভরা ছটফটানি শুনে বিপুল অট্টহাসি হেসে চলতে লাগ
প্রলয়-আনন্দে ঝঞ্ঝার তাণ্ডব।

পরেশ সভয়ে বললে, "অমি, এ ভাঙা মস্‌জিদ থর্-থর্ ক'রে কাঁপচে
মাথার ওপরে ভেঙে পড়বে না তো ?"

শীলাকে নিজের আরো কাছে টেনে এনে অমিয় নাচার ভাবে বললে
"ভেঙে পড়লেও উপায় কি ?"

শীলা কাতর ভাবে বললে, "ও দাদা, চল, আমরা বাইরে পালিয়ে যাই !"

—"পাগল ! বাইরে গেলে ঝড়ে উড়ে যাবি !"

প্রায় আধঘণ্টা পরে ঝড়ের বেগ কিছু ক'মে এল বটে, কিন্তু ঝম্-ঝম্
ঝম্-ঝম্ ক'রে বিষম বৃষ্টি সুরু হ'ল ! মস্‌জিদের একটা দরজা-জান্‌লার
পাল্লা ছিল না, বেগবান হাওয়ার ঝট্‌কায় হু-হু ক'রে ভিতরেও জল
ঢুকতে লাগল।

নিশীথ বললে, "অমি, গাড়ী থেকে টর্চ্চ্‌টা এনেচ ?"

—"এনেচি। কেন ?"

—"একবার জ্বেলে দেখ তো, কোন্‌দিকে শুক্‌নো ঠাঁই আছে ? অন্ধকারে
আমার পা বাড়াতে ভয় হচ্ছে, যদি সাপ-টাপ্ কিছু থাকে !"

টর্চ্চ্‌টা জ্বেলে একদিকে আলোর রেখা ফেলেই অমিয় চম্‌কে উঠল এবং
সঙ্গে সঙ্গে শীলা প্রায় কান্নার স্বরে ব'লে উঠল, "ও কে দাদা, ও কে ?"

প্রকাণ্ড ঘরের আধখানা ছাদ ভেঙে পড়েছে, এবং মেঝের উপরে স্তূপের
মত জ'মে রয়েছে ভাঙা টালি, ইট, বালি-সুরকির চাঙড়, কড়ি ও বরগা
প্রভৃতি। তারই ভিতরে পাথরের মস্ত পুতুলের মত স্থির ভাবে দুই হাঁটুর
উপরে মুখ রেখে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে অদ্ভুত এক মানুষের মূর্ত্তি !

দীর্ঘ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, লম্বা লম্বা চুল মাথা থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলে ড়েছে, গোঁফ-দাড়ী কামানো, পবোণে একটা কালো 'ওভাবকোট' ও ঢিলে জের! কিন্তু তাব চোখদুটো! মোটবেব 'হেড্‌লাইটে'র মত সেই দুই ক্ষু তীব্র দীপ্তিতে এমন উজ্জ্বল যে, তাদেব দিকে তাকাতেও কষ্ট হয়! তার ালো পোষাক আর কালো মুখ কালো অন্ধকাবে মিশিয়ে প্রায় অস্পষ্ট য়ে আছে, কিন্তু অস্বাভাবিক ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে তাব সেই চোখ দুটো পার্থিব বিভীষিকা সৃষ্টি কবেছে! দেখলেই বুকেব কাছটা ধড়্‌ফড় রতে থাকে!

অমিয় অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা কবলে, "কে তুমি?"

গম্ভীর স্ববে মূর্ত্তি বললে, "রাহী।"

—"তোমার নাম কি?"

—"আমি রাহী, এই পরিচয়ই যথেষ্ট।"

—"এখানে কেন?"

—"যেজন্যে তোমরা এখানে এসেচ, আমিও সেইজন্যেই এখানে!"

—"এতক্ষণ সাড়া দাও নি কেন?"

—"দরকার হয়নি ব'লে দিই নি।"

অমিয় টর্চ্চ্‌ নিবিযে ফেললে, চারিদিক আবার অন্ধকার। কিন্তু সকলের নে হ'তে লাগল, সেই অন্ধকারের ভিতর হ'তে অপরিচিত মূর্ত্তির চোখদুটো যেন থেকে থেকে আগুনের ফিন্‌কি ছড়িয়ে দিচ্ছে!

অমিয়কে দুইহাতে জড়িয়ে ধ'রে শীলা ভয়ার্ত্ত স্বরে চুপিচুপি বললে, "দাদা, শীগ্‌গির এখান থেকে বেরিয়ে চল, নইলে আমি হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাব!"

শীলা প্রায় কান্নার স্বরে ব'লে উঠল, "ও কে দাদা, ও কে ?"

পরেশ ও নিশীথও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে প'ড়েছিল। এতক্ষণ পরে পরেশ বললে, "অমি, এখানে দাঁড়িয়েও যখন ভিজ্‌তে হচ্ছে, তখন গাড়ীতে গিয়ে বসাই ভালো।"

বাইরে তখনো আঁধার-রাত্রির বুকে মাথা ঠুকে ঝড় চ্যাঁচাচ্ছে গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ, গাছেরা পরস্পরের গায়ে আছ্‌ড়ে প'ড়ে কেঁদে ককিয়ে বলছে মর্‌ মর্‌ মর্‌ মর্‌ এবং শূন্যের অসীম সাগর উছ্‌লে জলের ধারা ঝরছে ঝম্‌-ঝম্‌-ঝম্‌-ঝম্‌!

অমিয় কাণ পেতে শুনে বুঝলে পাহাড়ে-পথের উপর দিয়েও কল্‌-কল্‌ ক'রে জলস্রোত ছুটছে! এ পথে মোটর চালানো এখন মোটেই নিরাপদ নয় বটে, কিন্তু এই ভাঙা মস্‌জিদের ফুটো ছাদের তলায় অন্ধকারে ঐ বিচিত্র মূর্ত্তির সঙ্গে এখানে থাকতে তারও আর ইচ্ছা হ'ল না। সে শীলার হাত চেপে ধ'রে বললে, "চল, আমরা গাড়ীতেই গিয়ে বসি।"

অন্ধকারের ভিতরে একটা অস্ফুট শব্দ হ'ল—কে যেন চাপা গলায় হাসলে!

অমিয়ের ভয়ানক রাগ হ'ল,—তারা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে ভেবে ঐ লোকটা কি ঠাট্টার হাসি হাসছে? কিন্তু শীলার কথা ভেবে রাগ সামলে সে একেবারে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

শীলা বললে, "তখনি বলেছিলুম দাদা, এখানে এস না!"

অমিয় জোর ক'রে হেসে বললে, "আরে গেল, তুই কি ভেবেচিস্‌ ও-লোকটা ভূত?"

শীলা বললে, "ও ভূত কিনা জানিনা, কিন্তু ওকে দেখে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছিল!"

—"তোর সব-তাতেই বাড়াবাড়ি! নে, এখন গাড়ীতে উঠে বোস্!"

গাড়ীর উপরে উঠে ধুপ্ ক'রে ব'সে প'ড়ে শীলা বললে, "শীগ্‌গি 'স্টার্ট্' দাও দাদা, এখানে আর আধ-মিনিটও নয়।"

পরেশ ও নিশীথও গাড়ীর উপরে গিয়ে বসল। অমিয় 'স্টার্ট্' দি গাড়ীতে উঠল।

কিন্তু পথ তখন ছোটখাটো একটা নদীতে পরিণত হয়েছে—প্র হাঁটু-ভোর জল সশব্দে ছুটে চলেছে। এ-পথে কেমন ক'রে গাড়ী চালা তাই ভাবতে ভাবতে অমিয় 'হেড্-লাইট্'টা জ্বেলে দিলে!

কিন্তু ওরা আবার কে? 'হেড্-লাইটে'র জোর-আলো সুমুখের প পড়তেই দেখা গেল, পাশাপাশি ছয়জন লোক গাড়ীর দিকেই পায়ে পা এগিয়ে আসছে!

পরিত্যক্ত আলিনগর, দিনের বেলাতেই সেখানে মানুষের দেখা মেলে ন কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে, জলে ঝড়ে দুর্যোগে ধ্বংস-স্তূপে মধ্যে কারা এরা? এই কি পথে বেড়াবার সময়?

শীলা, পরেশ ও নিশীথ তাদের দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল!

পাশের জঙ্গল থেকে কতগুলো শেয়াল সমস্বরে কেঁদে উঠল! যে তারা এদের চেনে, যেন তারা এদের ভয় করে, যেন তারা পৃথিবীর জীবদে সাবধান ক'রে দিচ্ছে!

অমিয় ঘন ঘন মোটরের 'হর্ণ্' বাজাতে লাগল।

কিন্তু তারা যেন শুনতে পেলে না,—তালে তালে যেন মেপে মেপে প ফেলে সমান এগিয়ে আসছে—যেন সব দম-দেওয়া কলের মূর্ত্তি! প্রত্যেকে পরোণে সাদা কাপড়, প্রত্যেকের দেহের উপর-দিকটা আড়ষ্ট এবং প্রত্যেকে

টো পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর হাতের মত দুপাশে স্থির ভাবে ঝুলছে,—
াছে কেবল তাদের পাগুলো !

সেই জলে-ঝড়ে অমিয়ের দেহ ঘেমে উঠল, চেঁচিয়ে বললে, "কে তোমরা ?
ামার 'হর্ণ্' শুনতে পাচ্চ না ? স'রে যাও—নইলে মরবে !"

তারা কেউ সাড়া দিলে না, পথ জুড়ে তালে তালে গাড়ীর দিকে এগিয়ে
াসতে লাগল। যেন তারা থামতে জানে না, যেন কার অভিশাপ তাদের
ছুতেই থামতে দেয় না, যন্ত্র-চালিতের মত তাদের যেন চলতেই হবে
ারা পৃথিবীর মাটি মাড়িয়ে অনন্ত—অনন্ত কাল ধ'রে !

অমিয় বললে, "ডাকাত নয় তো ? পরেশ ! নিশীথ ! বন্দুক নাও !"

সকলে আপন আপন বন্দুক তুলে নিলে। তবু যারা আসছে তারা
মল না, ভয়ও পেলে না !

অমিয় চেঁচিয়ে বললে, "আর এক পা এগুলেই গুলি করব !"

ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ক'রে পায়ের শব্দ তুলে মূর্ত্তিগুলো আরো কাছে এসে
ল।

অমিয় মহা ফাঁপরে প'ড়ে ভাবতে লাগল—কারা এরা ? ডাকাত, না
াগল ? না এরা ভাবছে যে বন্দুক ছুঁড়ব ব'লে আমরা ঠাট্টা করছি ?
ন্তু আর তো ওদের কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয়, গাড়ীতে শীলা
য়েছে, কোন বিপদ হ'লে বাড়ীতে গিয়ে মুখ দেখাব কেমন ক'রে ? যা হয়
হাক্, আমার কথা না শুনলে এবারে আমি বন্দুক ছুঁড়বই !

সে আবার শুষ্ক স্বরে চেঁচিয়ে বললে,—"এই শেষবার বলচি, পথ
ছড়ে দাও !"

তারা সমান এগিয়ে আসছে, আসছে, আর আসছেই ! 'হেড্-লাইটে'র

তীব্র আলোকে তাদের রুক্ষ চুল ও বিস্ফারিত স্থির চক্ষের পাতা পর্য্য
স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! ছয়জোড়া নিস্পলক চক্ষেব পূর্ণদৃষ্টি অমিয়দেব দিে
স্থিব হয়ে আছে—প্রত্যেক চোখ যেন মড়ার চোখ!

তিনজনেই বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থিব করলে। মূর্ত্তিগুলো যখন গাড়ী
কাছ থেকে হাত-দশ-বারো তফাতে এসে পড়েছে, অমিয় তখন বললে, "আ
তিন গুণলেই তোমরা বন্দুক ছুঁড়ো!"

তবু তারা থামল না!

—"এক!"

—"দুই!" ....

—"তিন!"

গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুড়ুম্! তিনজনেই বুঝলে, তাদের লক্ষ্য ভুল হয় নি-
এত কাছ থেকে ভুল হ'তেই পারে না, কিন্তু তবু সেই মূর্ত্তিগুলো তা
তালে পা ফেলে এগিয়ে আর এগিয়ে আর এগিয়ে আসতে লাগল!

কী অসম্ভব ব্যাপার!

আচম্বিতে ভাঙা মস্‌জিদের ভিতর থেকে হা-হা-হা-হা ক'রে কে ব
পশুর কণ্ঠে মানুষেব স্ববে ভয়াবহ অট্টহাসি হাসতে লাগল।

শীলা আর্ত্তনাদ ক'রে অজ্ঞান হয়ে গদীর উপরে লুটিয়ে পড়ল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মরা মানুষের জ্যান্তো চোখ

—"দিনে দিনে হ'ল কি ? দুনিয়ায় বড় বড় সাধুর অভাব হয়েচে অনেক নই। আজকাল আবার বড় অসাধুরও খোঁজ পাওয়া যাচ্চে না! পুলিস-র্গর্টের রিপোর্ট দেখচি খালি কতগুলো গাঁটকাটা আর ছিঁচকে-চোরের তিহাস! দুত্তোর, খবরের নিকুচি করেচে!"—এই ব'লে জয়ন্ত খবরের গজখানা সজোরে মাটির উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে!

মাণিক কফি তৈরি করতে করতে বললে, "সহরে বড় বড় চোর-ডাকাত-ন নেই, এটা তো পুলিসের কৃতিত্বের পরিচয়! এজন্যে আমাদের সুন্দর বুও অনায়াসে বাহাদুরির দাবি করতে পারেন!"

—"কিন্তু চুরি ডাকাতি খুন-খারাপি না থাকলে পুলিসেরও চাকরি থাকবে , আর আমাদেরও পেটের ভাত হজম হবে না!"

মাণিক কফির পিয়ালা জয়ন্তের সামনে এগিয়ে দিলে।

পিয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে জয়ন্ত বললে, "কেবল তাই নয়। অপরাধীর ভাবে কোন কোন দেশে পুলিসের অত্যন্ত দুর্দ্দশাও হয়! য়ুরোপের একটা হরে চোরেরা একবার ধর্ম্মঘট করেছিল তা জানো ?"

মাণিক আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কি-রকম ? চোরেদের ধর্ম্মঘট ? এ যে হস্থের পক্ষে মস্ত-বড় সুখবর!"

—"হ্যাঁ, গৃহস্থের পক্ষে। কিন্তু যে সহরের কথা বলচি, সেখানকার লিস এটা সুখবর ব'লে মনে করে নি! সহর-বাসীরা হঠাৎ একদিন সকালে ঠে দেখলে, রাস্তায় রাস্তায় দেয়ালের গায়ে এই বিজ্ঞাপন: ' চুরি-ব্যবসায় অচল

হইয়া পড়িয়াছে! পুলিস এত-বেশী ঘুষ দাবি করে যে, চোরাই মাল বেচিয়া আমাদের আর কোন লাভ থাকে না! পুলিসের এই অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিবার জন্য এই নগরের চোর-সম্প্রদায় অদ্য হইতে চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিল'!"

— "তারপর?"

—"তারপর আর কি! দু-চারদিন পরেই সেখানকার পুলিস মানতে বাধ্য হ'ল যে, অতঃপর চোরেদের কাছ থেকে আর অত-বেশী ঘুষ দাবি করবে না। তখন চোরেরা আবার ধর্ম্মঘট বন্ধ করলে!"

এমন সময়ে পায়ের শব্দে বাড়ী কাঁপিয়ে এবং সুবিপুল ভুঁড়ি দুলিয়ে ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এদিকে ওদিকে নিক্ষেপ ক'রে হতাশ ভাবে বললেন, "এই যে, চা খাওয়া হয়ে গেছে দেখচি

জয়ন্ত বললে, "না, আমরা এইমাত্র কফি শেষ করলুম!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। কফি? এই গরমে? ওরে বাপ্‌রে, তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে! একশো টাকা বখসিস্ দিলেও আমি এখন এক কাপ্ কফি খাব না!"

জয়ন্ত বললে, "একশো টাকা বা কফির কাপ্ কিছুই আপনার ভাগ্যে নেই। আপনার জন্যে এখনি এক পিয়ালা চা আসবে!"

—"আর টোষ্ট, ডিম, জ্যাম্!"

—"তাও আসবে। আপনি নির্ভয়ে চেয়ারে ব'সে পড়ুন!"

ইতিমধ্যে মাণিক খবরের কাগজখানা কখন্ মাটি থেকে তুলে নিয়ে পড়তে সুরু ক'রে দিয়েছে। সে বললে, "জয়, তুমি কি আজকের কাগজখানা ভালো ক'রে পড়ো নি?"

—"না, পুলিস-কোর্টের কলম ছাড়া আর কিছু আমি দেখিনি।"

—"চট্টগ্রাম থেকে এদের নিজস্ব সংবাদদাতা কি লিখেচে জানো ?"

—"না।"

—"শোনো তাহ'লে" ব'লে মাণিক পড়তে আরম্ভ করলে :

"বিভীষণ বিভীষিকা !

রহস্যময় মেয়ে-চুরি !

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামে গ্রামে ভীষণ বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে ! মাসাধিক কালের মধ্যে এখানে তিনটি বিভিন্ন পরিবারের তিনটি মেয়েকে কে বা কাহারা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

আসল ব্যাপাব কিছুই বুঝা যাইতেছে না। এমন অদ্ভুত কাণ্ড এ-অঞ্চলে আর কখনও হয় নাই। পুলিস প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু যে-তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া আছে।

প্রথম ঘটনাটি এই : বীরনগর গ্রামের মধুসূদন কর্ম্মকারের বড় মেয়ে প্রমদা সন্ধ্যার সময়ে গ্রামের প্রান্তে পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল। কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসে নাই। প্রথমে সবাই ভাবিয়াছিল, সে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। কিন্তু পুষ্করিণীর তলা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহার দেহ পাওয়া যায় নাই। প্রমদার বয়স পনেরো বৎসর মাত্র। সবে গত মাসে তাহার বিবাহ হইয়াছে।

দ্বিতীয় ঘটনার বিবরণ : বীরনগর হইতে দশ মাইল তফাতে চণ্ডীপুর। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চৌধুরী এখানকার একজন বিশিষ্ট গৃহস্থ। তাঁহার দৌহিত্রীর নাম কুমারী কমলা দেবী, বয়স ষোলো বৎসর। এক রাত্রে গুমোট গরমে ঘুম হইতেছিল না বলিয়া কমলা বাহিরের বারান্দায় আসিয়া শয়ন করে।

শেষ-রাত্রে হঠাৎ কমলার ভীত চীৎকারে বাড়ীর আর সকলের ঘুম ভাঙিয়া যায়! কমলার পিতা ও পঞ্চাননবাবু প্রভৃতি বারান্দায় ছুটিয়া আসেন। কিন্তু কমলা তখন অদৃশ্য হইয়াছে!

পুলিসের তদন্তে আর একটি অদ্ভুত বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। বাড়ীর সকলে যখন কমলার জন্য খোঁজাখুঁজি ও ছুটাছুটি করিতেছিলেন, তখন গ্রামের পথ হইতে কে নাকি ভয়াবহ অট্টহাস্য করিয়া উঠিয়াছিল! সেদিন অমাবস্যার রাত্রি ছিল, সকলে অন্ধকারে পথে ছুটিয়া যায়, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। কেবল এক আশ্চর্য্য শব্দ শোনা যায়। অনেকগুলো লোক যেন একসঙ্গে সৈন্যদলের মত সমতালে সশব্দে পা ফেলিয়া ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতেছে!

তৃতীয় ঘটনা ঘটিয়াছে মাত্র দুই দিন আগে। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর,এন, সেনের একমাত্র কন্যা কুমারী শীলা তাঁহার ভ্রাতা মিঃ অমিয় সেনের সঙ্গে শিকার দেখিতে গিয়াছিলেন। পোড়ো সহর আলিনগরের কাছে কাহারা নাকি আক্রমণ করিয়া কুমারী শীলাকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখনো প্রকাশ পায় নাই, যথাসময়ে আমরা সব কথা জানাইব।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, একালে ইংরেজ-রাজত্বের কোন জায়গায় উপর-উপরি এমন তিন-তিনটি ঘটনা ঘটা সম্ভবপর কিনা? যদি সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়, তবে অনর্থক এই বিপুল পুলিস-বাহিনী পুষিয়া লাভ কি? যেখানে ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা পর্য্যন্ত চুরি যায়, সেখানে সাধারণ দরিদ্র প্রজারা কাহার মুখ চাহিয়া বাস করিবে? আমরা পুলিসের এই অকর্ম্মণ্যতার দিকে গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবু শুনতে শুনতে মুখগহ্বরে আধখানা 'টোষ্ট্' নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে তাঁর আর 'টোষ্ট্' খাওয়া হ'ল না, তিনি চ'টে-মটে ব'লে উঠলেন, "হুম্। যত দোষ নন্দ ঘোষ! যেখানে যা-কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে তার জন্যে দায়ী হচ্ছি আমরাই!"

জয়ন্ত জবাব দিলে না, নীরবে নস্যদানী বার ক'রে এক টিপ নস্য নিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, "সব ব্যাপারগুলোই আজগুবি! চোরেরা যে চুরি করতে এসে অট্টহাসি হাসে আর গোরাদের মত তালে তালে পা ফেলে চলে, আমার এতখানি বয়সে এটা এই প্রথম শুনলুম! তারা তো উদয়শঙ্করের মত তালে তালে নাচতে নাচতে পালালেও পালাতে পারত!"

বেয়ারা ঘরে ঢুকে বললে, "একজন সায়েব বাবু ডাকচেন!"

জয়ন্ত বললে, "এখানে নিয়ে এস।"

সুন্দরবাবু বললেন, "সায়েব বাবু আবার কি জীব?"

—"আমাদের বেয়ারা বিলাতী পোষাকে বাঙালীকে ঐ নামে ডাকে।"

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল একটি তরুণ যুবক। তার পরোণের বিলাতী পোষাক ইস্ত্রিহীন, এলোমেলো; মাথায় টুপী নেই—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চক্ষের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। দেখলেই মনে হয় সে যেন অত্যন্ত চিন্তিত ও বিপদগ্রস্ত!

জয়ন্ত সুধোলে, "আপনি কাকে চান?"

—"জয়ন্তবাবুকে। আমি ভয়ানক বিপদে প'ড়ে ছুটে এসেচি—"

—"আমারই নাম জয়ন্ত। আপনার নাম জানতে পারি কি?"

—"আমার নাম অমিয় সেন, আমি চট্টগ্রাম থেকে আসচি।"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে, "বসুন। খবরের

আমি ভয়ানক বিপদে প'ড়ে ছুটে এসেছি…

কাগজে বোধহয় এইমাত্র আপনারই নাম দেখেচি। আপনি তো চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এন, সেনের পুত্র ?"

অমিয় চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ব্যাপারটা যখন আগেই শুনেচেন তখন আমি যে কেন এখানে এসেচি, সেটাও বোধহয় বুঝতে পেরেচেন ?"

—"আপনার ভগ্নীকে আপনি উদ্ধার করতে চান ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, শীলাকে উদ্ধার না ক'রে বাবার কাছে আর মুখ দেখাব না !"

—"তাহ'লে আগে সমস্ত ঘটনা আমাদের কাছে খুলে বলুন।"

অমিয় খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "কিন্তু সব শুনে আপনি হয়তো আমাকে পাগল বা মিথ্যাবাদী ব'লে মনে করবেন।"

—"কেন ?"

—"সমস্ত ঘটনাটাই এমন অসম্ভব যে আমার বাবাও আমার কথা বিশ্বাস করেন নি। অথচ আমার প্রত্যেক কথাই সত্য।"

—"হোক্ অসম্ভব, তবু কোন কথাই আপনি যেন গোপন করবেন না। কিছু লুকোলে আমি আপনার কোন উপকারেই লাগব না, এইটুকু খালি দয়া ক'রে মনে রাখবেন।"

অমিয় তার কাহিনী বলতে লাগল। সে যা বললে তার অধিকাংশই আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি—গাড়ীর উপরে শীলার মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে যাওয়া পর্য্যন্ত। অতএব এখানে অমিয়ের কথার শেষ-অংশ মাত্র দেওয়া হ'ল :

"ওদিকে ভাঙা মস্‌জিদের ভিতর থেকে সেই অমানুষী হাসি, এদিকে

বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েও নির্ব্বিকারের মত সেই ছয়টা আড়ষ্ট দেহ একেবারে আমাদের গাড়ীর কাছে এসে পড়েছে, আমার পাশেই শীলার মূর্চ্ছিত দেহ প'ড়ে রয়েছে, চারিদিকে ঝোড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড নিঃশ্বাস, বৃষ্টির ঝর্-ঝর্ কান্না, মাথার উপরে আকাশ ঘন ঘন জ্বালছে বিদ্যুৎ-চকমকির ফিন্‌কি! আমি যেন কেমন আচ্ছন্নের মতন হয়ে গেলুম এবং সেই অবস্থাতেই বুঝতে পারলুম, পরেশ ও নিশীথও গাড়ীর ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পড়ল!

গাড়ীর সাম্‌নে এসে মূর্ত্তিগুলো থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই সময়ে তাদের চোখগুলো দেখে আমার বুক শিউরে উঠল! মরা মানুষ তাকিয়ে দেখলে বোধ করি তাদের দৃষ্টিও এইরকম দেখতে হয়! সে চোখগুলো যেন তাকিয়ে আছে মাত্র, কিন্তু তাদের ভিতরে কোন ভাবেরই আভাস নেই এবং তারা চোখ খুলে তাকিয়েও যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না!

মূর্ত্তিগুলো হঠাৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তিনজন এল গাড়ীর বাঁ-পাশে, আর তিনজন এল ডান-পাশে। সঙ্গে সঙ্গে 'হেড-লাইটে'র আলোক-রেখা ছাড়িয়ে তাদের দেহগুলো ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তারপর আমি কি করব না-করব ভাবতে-না-ভাবতেই আচম্বিতে দুখানা বিষম-কঠিন হাত আমার কোমর জড়িয়ে ধরলে! সে-হাতদুখানা কেবল কঠিন নয়, কী অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! যেন বরফে গড়া! আমি প্রাণপণে বাধা দিয়েও তাদের ঠেকাতে পারলুম না, হাতদুখানা আমাকে একটানে শূন্যে তুলে ধ'রে ছুঁড়ে ফেলে দিলে,—মাটিতে প'ড়ে মাথায় চোট্ লেগে আমিও তখনি অজ্ঞান হয়ে গেলুম এবং অজ্ঞান হ'য়ে যেতে যেতে আবার শুনতে পেলুম সেই অমানুষী হাহাহাহা হাসি!

যখন জ্ঞান হ'ল তখন মেঘলা আকাশে ঝাপ্‌সা ভোরের আলো ফুটে ওঠবার চেষ্টা করছে।

গাড়ীর 'হুডে'র উপরে মাথা রেখে পরেশ ও নিশীথ অভিভূতের মত প'ড়ে রয়েছে।

আমি পাগলের মত গাড়ীর কাছে ছুটে গিয়ে ডাকলুম, "শীলা! শীলা!"

পরেশ ক্ষীণ স্বরে বললে, "শীলা নেই!"

আমার কথা আর বেশী বাড়াব না। কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, প্রায় বৈকাল পর্য্যন্ত আমরা তিনজনে আলিনগরের সমস্তটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখলুম। কিন্তু পেলুম খালি পোড়ো-বাড়ীর পর পোড়ো-বাড়ী, ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ—সেখানে কোথায় শীলা, কোথায় সেই ছয়টা অদ্ভুত মূর্ত্তি, আর কোথায় ভাঙা-মস্‌জিদে-দেখা সেই ঘোর-কালো লম্বা লোকটা! কারুর কোন চিহ্নই নেই!

কি-রকম মন নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলুম, আর সমস্ত শুনে মা ও বাবার অবস্থাই বা হ'ল কি-রকম, এখানে সে-সব কথাও বলবার দরকার নেই।

নিশীথ আপনার শক্তির কথা জানে। সেই-ই আমাকে পরামর্শ দিলে, আপনার কাছে আসতে। তখনি আহত দেহে চট্টগ্রাম থেকে আপনার কাছে চ'লে এসেছি! জয়ন্তবাবু, এখন আপনার সাহায্যই আমার শেষ ভরসা!"

অমিয় স্তব্ধ হ'ল, জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বার বার নস্য নিতে লাগল।

মাণিক খবরের কাগজখানা নিয়ে আর-একবার পড়তে বসল।

খানিক পরে এই নীরবতা সইতে না পেরে সুন্দরবাবু ব'লে উঠলেন, "হুম্‌। মিঃ সেন, আপনি যা বললেন তার কিনারা করা জয়ন্ত বা পুলিসের কাজ নয়!"

অমিয় করুণ স্বরে বললে, "তবে আমার কি হবে?"

—"যা শুনলুম তা যদি পাগলের প্রলাপ না হয়, তাহ'লে রীতিমত ভৌতিক ব্যাপার ব'লেই মানতে হয়! জয়ন্ত কি পুলিস, ভূত ধরতে পারবে না, আপনি কোন ভালো রোজার খোঁজ করুন। আপনার বোনকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েচে।"

অমিয় অসহায়ের মতন কাতর ভাবে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

জয়ন্ত আর এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, "মাণিক, জিনিষ-পত্তর সব গুছিয়ে নাও। অমিয়বাবুর সঙ্গে আজই আমরা চট্টগ্রাম যাত্রা করব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পদচিহ্ন ও গোরস্থান

জনশূন্য আলিনগর! চারিধারে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢেউ-খেলানো প্রাচীর, বাতাসের ছোঁয়ায় ঐক্যতান-বাজানো বনভূমির শ্যামলিমা, মাঠে মাঠে জলের আল্পনা আঁকতে আঁকতে নদীর রূপোলী খেলা, কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় বন-মুর্গীরা, কোথাও হঠাৎ শীষ্ দিয়ে ওঠে অজানা গানের পাখী, কোথাও অনেক দূর থেকে শোনা যায় কার বাঁশীর হারিয়ে-যাওয়া সুর। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে নিসাড় হয়ে আছে জনশূন্য আলিনগর! পাহাড়ের উপর থেকে তাকে দেখায় একখানি ছবির মত।

বাড়ীর পর বাড়ী—কোন কোন বাড়ীর বয়সও বেশী নয়, আকারও জীর্ণ নয়। মাঝে মাঝে এক-একখানা বাগান-বাড়ীও চোখে পড়ে—এখনো দু-চারটে কঠিনপ্রাণ ফুলগাছ অযত্নেও বেঁচে থেকে রং ফুটিয়ে আগেকার গৌরবের পরিচয় দেবার ক্ষীণ চেষ্টা করছে!

কিন্তু অধিকাংশ বাড়ীই নীরবে যেন প্রচার করতে চায় ধ্বংস-দেবতার মহিমা! তাদের দেখলেই মনে পড়ে খণ্ডবিখণ্ড মাংসহীন কঙ্কালকে! স্থানে স্থানে ধ্বংসস্তূপের জন্যে চলবার পথ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এ যেন কোন অভিশপ্ত পৃথিবীর এক অংশ—মৃত মানুষের স্মৃতি আছে, কিন্তু জ্যান্তো মানুষের দেখা নেই! মাঝে মাঝে এক-একটা মস্জিদ, কিন্তু তাদের ছায়ায় আজ আর কেউ উপাসনা করতে আসে না। থেকে থেকে এক-একটা

ঘুঘুর বিষাদ-মাখা সুর যেন মৌন বিজনতার দীর্ঘশ্বাসের মত জেগে উঠেই স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে!

জয়ন্ত সারাদিন ধ'রে আজ আলিনগরের জনশূন্যতার মধ্যে ঘুরে এবং তার সঙ্গে আছে মাণিক, অমিয়, পরেশ, নিশীথ ও সুন্দরবাবু।

জয়ন্তের সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবুর এখানে আসবার কোনই দরকা ছিল না। কিন্তু খানিকটা কৌতূহলে প'ড়ে ও খানিকটা এই সুযোগে নূত দেশে বেড়াবার ঝোঁকে সুন্দরবাবুও কিছুদিনের ছুটি নিয়ে জয়ন্ত ও মাণিকে সঙ্গী হয়েছেন।

সারাদিনে কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছুই আবিষ্কার করা গেল না। বৈকালে তারা সহরের প্রান্তে একটা ছোট নদীর ধারে এসে দাঁড়াল।

সুন্দরবাবু সারাদিনই কাঠ-ফাটা রোদে এমন টো টো ক'রে ঘু বেড়ানোর বিরুদ্ধে কঠিন কঠিন মতপ্রকাশ ক'রে আসছিলেন, কিন্তু এইবা তিনি রীতিমত বিদ্রোহ প্রকাশ ক'রে বললেন, "হুম্! আমি বাবা আর এ পা নড়ছি না! তোমাদের খাতিরে প'ড়ে শেষটা কি আত্মহত্যা করব এখানে সর্দ্দি-গর্ম্মি হ'লে দেখবে কে?"

জয়ন্ত একবার সুন্দরবাবুর দিকে ফিরে তাকালে। মরুভূমিতে মত তাঁর বিপুল টাকের উপর দিয়ে দর-দর ঘামের ধারা নেমে আসছে এ পথশ্রমে তাঁর বিরাট ভুঁড়ি হাপরের মত একবার ফুলে উঠছে ও একবার চুপ যাচ্ছে! দেখে তার দয়া হ'ল। বললে, "আচ্ছা সুন্দরবাবু, এইবা আমরা খানিকটা বিশ্রাম করতে পারি। আমাদের সহর দেখা শেষ হয়েছে

সুন্দরবাবু উচ্চস্বরে একটি সুদীর্ঘ "আঃ" উচ্চারণ ক'রে নদীতীরের বালি উপরে হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে পড়লেন।

অমিয় বললে, "তাহ'লে এর পরে আমরা কি করব ?"

জয়ন্ত বললে, "আজকের রাতটা আমরা এইখানেই কাটিয়ে দেব।"

সুন্দরবাবু ভয়ানক চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, "অ্যাঁ, সে কি কথা ? থাক্‌ব বললেই তো থাকা হয় না, এখানে থাকব কোথায় ?"

জয়ন্ত বললে, "যদিও আজ চাঁদ উঠবে না, তবু মাথার উপরে আকাশের দোয়া আছে তো ?"

—"যদি বৃষ্টি আসে ?"

—"এখানে মাথা গোঁজ্‌বার জন্যে পোড়ো-বাড়ীর অভাব নেই! গোটা শহরটাই তো আজ আমাদের দখলে!"

সুন্দরবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "আ-হা-হা-হা, ম'রে যাই আর কি! সব ব্যবস্থাই তো ক'রে দিলে দেখছি! কিন্তু পোড়ো-বাড়ীতে পোড়া পেটের অন্ন জোটাবে কে ?"

—"অন্ন আজ আর জুটবে না।"

—"হুম্‌। মাপ কর ভাই, আমি বিধবা স্ত্রীলোক নই, উপুস-টুপুস আমার ধাতে সহ্য হয় না।"

—"তাহ'লে আপনি বাসায় ফিরে যান।"

—"একলা ?"

—"কাজেই।"

—"হুম্‌!" সুন্দরবাবু একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন,—সূর্য্যি ডুবু-ডুবু! সন্ধ্যা আসি-আসি করছে। রাত-আঁধারে এখানে কী সব কাণ্ড হয় অমিয়ের মুখে তা শুনতে বাকি নেই। একলা এখান থেকে ফেরা অসম্ভব, কারণ সুন্দরবাবু ভূত-পেত্নী মানেন। এবং অমিয়ের বোনে শীলাকে যে মানুষে

চুরি করেছে, এ-কথাও তিনি বিশ্বাস করেন না। একলা বাসায় ফেরবার সময়ে যদি তাদের কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়?......সুন্দরবাবু অত্যন্ত অসময়ে এখন বুঝতে পারলেন যে, এই সব নির্ব্বোধ, গোঁয়ার ছোক্রার দলে ভিড়ে তিনিও বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি!

জয়ন্ত তাঁর মনের ভাব আন্দাজ ক'রে মৃদু হেসে বললে, "ভয় নেই সুন্দর-বাবু, আজ রাতে অন্ন না জুটলেও অন্য কিছু জুটতে পারে।......নিশীথবাবু, বলুন তো, আপনাদের গাড়ীতে রসদ কি আছে?"

নিশীথ বললে, "এক কাঁদি মর্ত্তমান কলা, ল্যাংড়া আম, সন্দেশ, ছয় ডজন চিকেন-স্যাণ্ডউইচ, কিছু কেক আর কিছু বিস্কুট।"

জয়ন্ত বললে, "অতএব সুন্দরবাবুর আজ উপোস করবার ভয় নেই।"

সুন্দর বাবু অল্প-একটু হেসে বললেন, "তাহ'লে তোমরা এখানে রাত্রিবাস করবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছ?"

—"কতকটা তাই বটে।"

—"এটা আগে আমাকে জানালেই পারতে! এখানে রাত কাটাবার প্রস্তাব আমার ভালো লাগছে না।"

এমন সময়ে মাণিক বললে, "অমিয়বাবু, আপনি না বলেছিলেন, কোন মানুষ এখানে আসতে চায় না?"

—"হ্যাঁ। এ-জায়গাটার বদ-নাম আছে। আর সে বদ-নাম যে মিছে নয়, তারও প্রমাণ আমরা পেয়েছি।"

—"তাহ'লে বালির উপরে এই পায়ের দাগগুলো কিসের?"—ব'লে মাণিক নদীর তীরে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করলে।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে লাগল।

বালুতটে লম্বা পায়ের দাগের সারি,—নদীর জলের দিক থেকে উপরদিকে উঠে এসেছে! আর সবগুলোই হচ্ছে মানুষের পায়ের দাগ!

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি পায়ের দাগ পরীক্ষা করতে জানেন?"

—"পুলিসে কাজ করি, তা আর জানিনা?"

—"আমেরিকার 'রেড-ইণ্ডিয়ান'রা পুলিসে কাজ করে না, কিন্তু পায়ের দাগ দেখে অপরাধী ধরতে তারা যেমন ওস্তাদ, পৃথিবীর কোন বড় ডিটেক্‌টিভও তেমন নয়। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্। আমাদের সাম্‌নের এই দাগগুলো দেখে অনেক কথাই বলা যায়।"

—"হুম্। কি বলা যায় শুনি?"

জয়ন্ত পকেট থেকে গজকাঠি বার ক'রে একমনে দাগগুলো মাপতে লাগল। তারপর বললে, "দাগগুলো যখন এত স্পষ্ট তখন নিশ্চয়ই পুরাণো নয়। হয়তো কালই দাগগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। এখান দিয়ে একদল লোক গিয়েছে। সে দলের একজন লোক খুব-বেশী ঢ্যাঙা। বেঁটেদের চেয়ে লম্বা লোকদের পায়ের দাগের মধ্যে ব্যবধান হয় বেশী। দলের একজন লোক খুব মোটা, তাই তার পায়ের দাগ বালির ভিতরে বেশী গভীর হয়ে বসেছে। দলের একজনের ডান পা খোঁড়া—বালির উপরে তার ডান পায়ের আঙুলের চিহ্ন রয়েছে, কিন্তু গোড়ালির চিহ্ন নেই! এখানে ছয়জন লোকের পায়ের দাগ আছে! আমি ছয়জোড়া আলাদা আলাদা পায়ের মাপ পেয়েছি। অমিয়বাবু, আপনাদের যারা আক্রমণ করেছিল—"

বিবর্ণমুখে অমিয় ব'লে উঠল, "তাদের দলেও ছয়জন লোক ছিল!"

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "এগুলো তাদেরই পায়ের

দাগ হ'লে বলতে হয়, তাদের ভূত-প্রেত ব'লে সন্দেহ করবার কোন কা
নেই। তারা ছায়ামূর্ত্তি হ'লে এখানে তাদের পায়ের দাগ পড়ত না!"

পরেশ বললে, "তারা ভূত-প্রেত কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের ব
গুলি খেয়েও তারা যে এগিয়ে এসেছিল, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই!

মাণিক বললে, "কিন্তু তখন কি আপনাদের মাথার ঠিক ছিল? নিশ্চয়
আপনাদের গুলিতে তারা আহত হয় নি!"

নিশীথ বললে, "আমাদের পক্ষে জোর ক'রে কিছু বলা সাজে না, আ
অসম্ভবে কেউ বিশ্বাস করবেই বা কেন? কিন্তু জানবেন, তারা আমাদের এ
কাছে ছিল যে অতি-বড় আনাড়ির বন্দুকের গুলিও ব্যর্থ হবার কথা নয়!"

জয়ন্ত বললে, "যাক্, এখন আর ও-নিয়ে তর্কের দরকার নেই, কা
সেই মূর্ত্তি ছ'টা সামনে না থাকলে ও-তর্কের কোন মীমাংসাই হবে না
চেয়ে এখন দেখা যাক্, ঐ দাগগুলো কোন্ দিকে গিয়েছে?"

সুন্দরবাবু তখন 'রসদ' খানাতল্লাস করবার জন্যে নিশীথদের মোটে
ভিতরে প্রবেশ করেছেন!

আগেই বলা হয়েছে পায়ের দাগগুলো উঠে গিয়েছে উপর দিকে। সক
সেই রেখা ধ'রে ঢালু জমির উপর দিয়ে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু বেশীদূর যে
হ'ল না। কারণ নদীর প্রায় ধারেই রয়েছে একটা জঙ্গলময় জমি, একসম
তার চারিদিকে যে প্রাচীর ছিল, স্থানে স্থানে তার কিছু কিছু চিহ্ন আজ
বর্ত্তমান রয়েছে। পায়ের দাগগুলো সেই জমির ভিতরেই প্রবেশ করেছে!

সকলে ভাঙা প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মাণিক উত্তেজিত ক
বললে, "সারাদিনের পর একটা হদিসের মত হদিস মিল্‌ল বটে, কিন্তু আ
বোধহয় আর-কিছু নূতনত্ব পাওয়া যাবে না। সূর্য্য ডুবে গিয়েছে!"

পশ্চিমের আকাশে তখন সোনালি ও লাল রং গুলে কে যেন নূতন ছবি াকবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে অন্ধকার -তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে! ....সুমুখের জমির ঝোঁপঝাপের আশে-শে অন্ধকার এখনি ঘন ও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। চারিদিক এমন স্তব্ধ একটা সূচ পড়লেও শোনা যায়! সেই মৌনতার ভিতরে মাথার উপর দিয়ে ন একঝাঁক বক উড়ে গেল, তখন তাদের ডানাগুলোর ঝট্‌পট্‌ শব্দ শুনে ন হ'ল, যেন অনেকগুলো ভৌতিক আত্মা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট্‌ করছে!

এমন সময় দেখা গেল, সুন্দরবাবু হাঁস্‌ফাস্‌ করতে করতে দৌড়ে আসছেন -তাঁর একহাতে খানকয় স্যাণ্ড্‌উইচ্‌ এবং অন্য হাতে এক ছড়া কলা! ছে এসেই তিনি বললেন, "এই ভর্‌সন্ধ্যেবেলায়, এই মারাত্মক জায়গায় মাকে একলা ফেলে তোমরা কোথায় পালিয়ে যেতে চাও?"

মাণিক বললে, "সে কি সুন্দরবাবু, অমন ঝুড়ীভরা আম, কলা, কেক, শ, বিস্কুট আর স্যাণ্ডউইচের মাঝখানেও নিজেকে আপনি একলা ব'লে করছিলেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ঠাট্টা কোরোনা মাণিক, ও-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ রি না! কিন্তু জয়ন্ত, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

—"ঐ জমির মধ্যে। পায়ের দাগগুলো ওর মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।"

সুন্দরবাবু দু-চারবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে বললেন, "বাব্বাঃ, ওটা যে রস্থান ব'লে মনে হচ্ছে!"

—"হ্যাঁ, ওটা গোরস্থানই বটে! এখনো দু-চারটে কবরের পাথর অটুট ছে। আমি জানতে চাই, এই পরিত্যক্ত সহরে, এই পোড়ো ভাঙা গোর-নে ছয়জন মানুষ কি উদ্দেশে এসেছিল? হয়তো তারা এখনো ওর

তাঁর এক হাতে খানকয় স্যাণ্ড্উইচ্ এবং অন্য হাতে একছড়া কলা…

মধ্যেই আছে। কারণ পায়ের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এ পথ দিয়ে এখনো তারা বেরিয়ে আসে নি।"

—"হয়তো তারা অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।"

—"হ'তে পারে। কিংবা এখনো তারা বেরিয়ে যায় নি।"

—"কিন্তু আর যে আলো নেই!"

—"আকাশের আলো নেই, আমাদের আলো আছে। সুন্দরবাবু, ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা ছ'টা বড় বড় পেট্রলের লণ্ঠন এনেছি। সেগুলো জ্বাললে এখানটা আলোয় আলো হয়ে উঠবে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "শোনো জয়ন্ত, রাত্রিবেলায় বেড়াবার পক্ষে গোরস্থান খুব ভালো জায়গা নয়! আমরা তো কাল সকালেও ওর মধ্যে যেতে পারি?"

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বললে, "এক রাত্রের হেরফেরে মস্ত সুযোগও নষ্ট হয়ে যেতে পারে! আমি আজকেই এই গোরস্থানটা দেখব!"

আচম্বিতে খানিক তফাতে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ক'রে একটা অত্যন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর অট্টহাসি জেগে উঠল!

সুন্দরবাবু চমকে একেবারে দলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন—তাঁর হাত থেকে কলার ছড়া খ'সে প'ড়ে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক তখন ঝাপ্‌সা, জয়ন্ত কারুকেই দেখতে পেলে না—সে বুকের উপরে দুই হাত রেখে স্তব্ধ ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য্য অট্টহাসি শুনতে লাগল!

অমিয় ম্লানমুখে অস্ফুট স্বরে বললে, "সেদিনও আমরা এই অমানুষী হাসিই শুনেছিলুম!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবার সেই মারাত্মক 'ছয়'

নদীর মত শব্দেরও স্রোত আছে। নদীর স্রোত দেখা যায়, কিন্তু শব্দের স্রোত ধরা পড়ে কাণে।

খানিকক্ষণ ধ'রে সেই ভয়াবহ অট্টহাসির শব্দ ঠিক স্রোতের মতই শূন্যতার মধ্য দিয়ে অবিরাম বয়ে চলল। তারপর হঠাৎ হাসি থেমে গেল এবং তার প্রতিধ্বনিগুলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যেন নিস্তব্ধতার মহাসাগরে।

সুন্দরবাবু তখন দুইহাতে দুই কাণ চেপে মাটির উপরে উবু হয়ে ব'সে পড়েছেন।

অমিয়, নিশীথ ও পরেশ প্রাণপণে পরস্পরের হাত চেপে ধ'রে আড়ষ্টের মত দাঁড়িয়ে রইল।

জয়ন্ত বললে, "যে হাসছে, সে হয় পাগল, নয় আমাদের ঠাট্টা করছে!"

মাণিক কিছু বললে না, কেবল নিজের বন্দুকের কুঁদোটা মাটির উপরে ঠক্ ঠক্ ক'রে ঠুকতে লাগল।

রাত্রিময়ী বনভূমি, ভয়-ভরা রহস্যময় তার রূপ! মাথার উপরে অন্ধকার আকাশ-দানবের হাজার হাজার তারকা-চক্ষু মিট্‌মিট্ ক'রে তাকিয়ে আছে, তার তলায় আরো-ঘন অন্ধকারে পর্ব্বতশিখরগুলো যেন দৈত্যপুরীর বিচিত্র ও বিরাট অভিনয়-ভঙ্গিতে স্থির ও স্তম্ভিত হয়ে আছে এবং তারও তলায় যেন

সীমাহারা বিশাল অরণ্য সভয়ে বদ্ধস্বরে থেকে থেকে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে

ঘুঘুর ম্রিয়মান স্বরকে ঘুম পাড়িয়ে জেগে উঠেছে প্যাঁচার বিরক্ত, কর্কশ কণ্ঠ—সে যেন এই বিপুল বনকে এবং এই বনের ভিতরে আজ যারা এসে পড়েছে তাদের সবাইকে ক্রমাগত অভিশাপের পর অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে এবং তারই সঙ্গে তাল রেখে ঘন ঘন বেজে উঠছে কালো বাদুড়দের অলক্ষুণে ডানাগুলো!

সুন্দরবাবু শিউরে শিউরে ব'লে উঠলেন, "আলো জ্বালো, আলো জ্বালো, আলো জ্বালো!"

পেট্রলের লণ্ঠন আনবার জন্যে পরেশ গাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল।

জয়ন্ত তার একখানা হাত ধ'রে তাকে থামিয়ে বললে, "কোথায় যাচ্ছেন?"

—"আর যে অন্ধকার সইতে পারছি না, আলোগুলো এনে জ্বেলে ফেলি।"

—"না। যদি এখানে সত্যিই শত্রু থাকে, তাহ'লে আলো জ্বাললে আমাদের দেখতে পাবে। এখন অন্ধকারই আমাদের বন্ধু।"

সুন্দরবাবু ব'সে ব'সেই পিছনে হট্‌তে হট্‌তে বললেন, "কিন্তু শত্রুরা অন্ধকারেই আমাদের দেখতে পেয়েছে—ঐ ঝোঁপের ভিতর থেকে তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে!"

মাণিক দেখলে সামনের একটা ঝোঁপ থেকে সত্যসত্যই চার-চারটে চোখের আগুন জ্বল্‌ছে আর নিব্‌ছে—জ্বল্‌ছে আর নিব্‌ছে!

অমিয় ও নিশীথ বন্দুক তুললে।

চার চার-টে চোখের আগুন জ্বলছে আর নিবছে

জয়ন্ত হেসে বললে, "খুব-সম্ভব দুটো শেয়াল আশ্চর্য্য হয়ে আমাদের দেখছে!"

তারপরেই আগুন-চোখগুলো আর দেখা গেল না।

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, মিছে ভয় পেয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম করবেন না। ভয় বড় সংক্রামক। একজন ভয় পেলে আর সকলেও ভয় পাবে। অথচ এখানে ভয় পাবার মত কিছুই আমি দেখছি না।"

কিন্তু সুন্দরবাবু জয়ন্তের কথা শুনতে পেলেন ব'লে মনে হ'ল না,—তিনি তখন কাণ পেতে অন্য কি যেন শুনছিলেন!

মাণিক চুপিচুপি বললে, "জয়, নদীর জলে ছপ্-ছপ্ শব্দ হচ্ছে। কে যেন নদী পার হচ্ছে!"

তারপরেই শব্দটা থেমে গেল।

খানিক পরে খুব কাছেই শোনা গেল কার পায়ের শব্দ! কে দ্রুতপদে গোরস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে! কিন্তু সে যে কে, কিছুই নজরে পড়ল না, ছিদ্রহীন অন্ধকার তার মূর্ত্তিকে একেবারে গ্রাস ক'রে ফেলেছে!

পায়ের শব্দও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

অমিয় অস্ফুটস্বরে বললে, "জয়ন্তবাবু, যেখানে দিনের বেলায় মানুষ আসতে ভয় পায়, সেখানে এমন সময়ে এই অন্ধকারে যে বেড়াতে আসে, তাকে কি সাধু ব'লে মনে হয়?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। কিন্তু এখান দিয়ে যে গেল সে কি মানুষ? এত রাত্রে এই পোড়ো সহরের গোরস্থানের সঙ্গে জ্যান্তো মানুষের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমরা চোখে দেখছি খালি অন্ধকার, ও কিন্তু দিব্যি হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গেল!"

মাণিক বললে, "জয়, আমরাও কি ওর পিছনে পিছনে গোরস্থানে গিয়ে ঢুকব ?"

জয়ন্ত বললে, "গোরস্থানে ঢুকতে হ'লে আলো জ্বালতে হয়। কিন্তু এখন আলো জ্বালা আর নিজে-থাকতে ধরা দেওয়া একই কথা! কি যে করব বুঝতে পারছি না!"

সুন্দরবাবু বললেন, "এখন আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে, মানে মানে গাড়ীতে গিয়ে উঠে পড়া। নইলে ভূত কি মানুষ শত্রুর হাতে না হোক্, সাপ কি বিচ্ছুর কামড়ে আমাদের মৃত্যু হবে অনিবার্য্য!"

পরেশ বললে, "এইমাত্র আমার পায়ের ওপর দিয়ে সড়্ সড়্ ক'রে কি চ'লে গেল!"

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে লাফাতে ও পা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "হুম্। আমার পায়ে উঠলে সে নিশ্চয়ই আমাকে কাম্ড়ে দেবে! এই, হুস্ হুস্! এই, হুস্ হুস্!"

মাণিক হেসে ফেলে বললে, "সুন্দরবাবু, হুস্-হুস্ ক'রে আপনি কি কাক তাড়াচ্ছেন ?"

সুন্দরবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, "মরছি নিজের জ্বালায়, এখন আর ঠাট্টা ক'রে কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিওনা মাণিক!.........ওরে বাস্ রে, এ কী অন্ধকার! দুনিয়ায় এত এত অন্ধকারও থাক্তে পারে! অ জয়ন্ত, কোন্ দিকে গাড়ী আছে ব'লে দাও, তোমরা না যাও, আমি একলাই গাড়ীতে গিয়ে ব'সে থাক্‌ব!"

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন, এবং আচম্বিতে বনের ভিতর থেকে জেগে উঠল বাঘের গম্ভীর গর্জ্জন!.........তিনি চম্‌কে আবার পায়ে

পায়ে পিছিয়ে দলের মাঝখানে এসে হতাশ ভাবে বললেন, "তাহ'লে উনিও এখানে আছেন ?" তাড়াতাড়ি পিঠ থেকে বন্দুকটা নামিয়ে তিনি আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হ'লেন ও সাপের ভয়ে মাঝে মাঝে পা ঝাড়তে লাগলেন !

শৃগালদের সম্মিলিত কোলাহল জানিয়ে দিলে, এখন দুপুর রাত্রি ! নদীর কলতান শোনাচ্ছে কান্নার মত ! আকাশ একে অন্ধকার, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল অধিকতর পুরু আর-একটা অন্ধকারের ঘোমটা ছড়িয়ে প'ড়ে আকাশের তারকা-নেত্রগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে।

জয়ন্ত বললে, "মেঘ উঠেছে। আজও হয়তো ঝড়-বৃষ্টি হবে !"

অমিয় বললে, "তাহ'লে আমাদের দুর্দ্দশার বাকি কিছু আর রইল না ! এই বেলা—"

কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রইল—সেই আসন্ন দুর্য্যোগের বিভীষিকা, সেই নিবিড় তিমিরের ভয়াল অন্ধতা, সেই নানাশব্দবিচিত্র রাত্রির গভীরতা, সেই পরিত্যক্ত সমাধিক্ষেত্রের অমানুষিকতার ভিতর থেকে জাগ্রত হ'ল ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক এক কণ্ঠধ্বনি—কে যেন আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে কাদের ডেকে ডেকে তীব্র স্বরে বলছে—"ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় আয় তোরা আয় রে ! অন্ধকারে যারা দেখতে পায় তারা আসুক এখন অন্ধকারে যারা দেখতে পায় না তাদের কাছে ! আকাশের মেঘ তোদের ডাকছে, নিঝুম রাতের আঁধার তোদের ডাকছে, মৃত আত্মার বন্ধু তোদের ডাকছে। কবরে কবরে দুয়ার খুলে যাক্, কফিনে কফিনে জীবন জাগুক্, মরা চোখে চোখে আলো ফুটুক্। বেগম-সাহেবা ব'সে ব'সে কাঁদছে, বাঁদীরা অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না, আলো নিয়ে তোরা সবাই আয় আয়,—ওরে আয় রে !"

বোঁ-বোঁ-বোঁ-বোঁ ক'রে হঠাৎ একটা পাগ্‌লা হাওয়ার ঝাপ্‌টা ব'য়ে গেল, কড়্-কড়্-কড়্-কড়্ ক'রে বজ্রের ধমক শোনা গেল, মড়্-মড়্-মড়্-মড়্ ক'রে বড় বড় গাছের মাথা মাটির দিকে নুয়ে পড়ল! বাঘ আর ভয়ে গর্জ্জন করছে না, প্যাঁচা-বাদুড় ভয়ে আর ডানা ঝট্‌পটিয়ে উড়ছে না, শৃগালরা ভয়ে আর আগুন-চোখ মেলে তাকাচ্ছে না!

তারপরেই খল্-খল্-খল্-খল্ ক'রে আবার সেই অট্ট হাসির পর হাসির স্রোত!

অমিয় প্রায়-আর্ত্তস্বরে ব'লে উঠল, "ও হাসি আমি চিনি, কিন্তু অমন ক'রে কথা কইলে কে?"

সুন্দরবাবু ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "কে ডাকছে, কে আসবে, কে অন্ধকারে দেখতে পায়, কে বেগম আর কেই বা বাঁদী? আমরা কি স্বশরীরে নরকে এসে পড়েছি?"

জয়ন্তও যেন আপন মনেই অস্ফুট স্বরে বললে, "বেগমই বা কে, আর বাঁদীই বা কারা? এ কি পাগলের প্রলাপ? মাণিক, তোমার কি মত? লণ্ঠন-গুলো জ্বেলে আমরা কি গোরস্থানে ঢুকে ঐ পাগ্‌লাটাকে আক্রমণ করব?"

মাণিক সজোরে জয়ন্তের কাঁধ চেপে ধ'রে বললে, "চুপ চুপ! ঐ দেখ!"

জয়ন্তের দুই চক্ষে অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠল! তাদের কাছ থেকে প্রায় দুইশত গজ তফাতে, গোরস্থানের ভিতরে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে কতগুলো আলো! তাহ'লে ঐ গোরস্থান নির্জ্জন নয়? ওখানে আলো নিয়ে কারা কি করছে?

আবার সেই কণ্ঠস্বর!—"ওরে আয়, ওরে আয় আয় তোরা আয় রে! রোস্‌নাই কৈ, খানা কৈ, বিছানা কৈ?"

আলোগুলো এতক্ষণ এলোমেলো ছিল, হঠাৎ এখন সার বেঁধে একদিকে এগিয়ে চলল!

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। ও হচ্ছে আলেয়ার আলো!"

পরেশ বললে, "না, ও আলেয়ার আলো নয়! যাদের হাতে আলো আছে, তাদেরও আব্ছা-আব্ছা দেখা যাচ্ছে!"

নিশীথ বললে, "কিন্তু ভালো ক'রে কিছুই দেখা যাচ্ছে না! কে ওরা? এই গোরস্থানের ভিতরে কি ডাকাতদের আড্ডা আছে?"

জয়ন্ত বললে, "অমিয়বাবু, আপনাদের ছয়জন লোকে আক্রমণ ক'রেছিল তো?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"মাণিক, নদীর তীরে আমরাও আজ ছয়জোড়া পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছি তো?"

—"হ্যাঁ।"

—"এখন ঐ আলোগুলো গুণে দেখ দেখি!"

মাণিক গুণ্তে গুণ্তে বললে, "এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়! ছ'টা আলো—তার মানে ছ'জন লোক!"

অমিয় উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "জয়ন্তবাবু, জয়ন্তবাবু! তাহ'লে ওরাই আমাদের শীলাকে চুরি করেছে! ওরা ভূতই হোক্ আর মানুষই হোক্, কিছুই আমি কেয়ার করি না,—আমি এখনি ওদের আক্রমণ করব—আমার বোনকে উদ্ধার করব—হয় আমি মরব নয় ওদের মারব!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধ'রে বললে, "শান্ত হোন অমিয়বাবু, এখন গোঁয়ার্তুমি করবার সময় নয়! ওখানে যদি ডাকাতের দল থাকে

তাহ'লে ওদের দলে কত লোক আছে তা কে বলতে পারে? আমরা ওখানে গিয়ে প্রাণ দিলে তো আপনার বোনের কোন উপকার হবে না!"

মাণিক বললে, "আলোগুলো আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!"

জয়ন্ত স্থির ভাবে বললে, "যাক্ গে। আমাদের এখানে অপেক্ষা করা সার্থক হয়েছে। কাল সকালে এই গোরস্থানই হবে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র! আজ এই অন্ধকারে অজানা জায়গায় গোলমাল ক'রে আমরা কিছুই হয়তো করতে পারব না, মাঝখান থেকে শত্রুরা সাবধান হয়ে স'রে পড়বে। বৃষ্টি এল ব'লে, রাত পোয়াতে আর ঘণ্টাকয় মাত্র দেরি আছে, বাকি রাতটুকু মোটরে ব'সে কাটিয়ে দিই গে চল।"

অমিয় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়ন্তের কথামত নিজেদের মোটর-গাড়ীর দিকে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল।

—সঙ্গে সঙ্গে সকলে শুনতে পেলে, বনের পথে আবার কার একখানা মোটর-গাড়ীর গর্জ্জন,—গাড়ীখানা যেন খুব তাড়াতাড়ি ছুটছে!

অমিয় আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "এখানকার সবই কি অস্বাভাবিক! এমন জায়গায় এমন সময়ে কে আবার মোটরে চ'ড়ে হাওয়া খেতে এল?"

নিশীথ বললে, "একখানা নয়, আবার আর একখানা মোটর! ঐ শোনো, এখানাও খুব জোরে ছুটে চলেছে!"

মাণিক বললে, "ডাকাতরা আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে কি মোটরে ক'রে দলবল নিয়ে এল?"

আচম্বিতে অরণ্যের ভিতরে দূরে একটা ভয়ানক শব্দ হ'ল! সকলে সবিস্ময়ে শুনছে, এমন সময়ে আবার সেই রকম আর একটা শব্দ।

অমিয় বললে, "এ যেন কোন accidentএর শব্দ!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে শুক্‌নো গলায় বললে, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, accidentই বটে। আমাদেরই সর্ব্বনাশ হ'ল বোধ হয়!”

যেখানে তাদের গাড়ী ছিল, সেখানে গিয়ে দুখানা মোটরই আর খুঁজে পাওয়া গেল না!

জয়ন্ত তিক্তস্বরে বললে, “আমরা এখন অসহায়! আমাদের অদৃশ্য শত্রু এসে দুখানা মোটরই চালিয়ে ছেড়ে দিয়েছে আর চালকহীন গাড়ী দুখানা খানিক দূরে এগিয়েই গাছে কি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।”

সুন্দরবাবু বললেন, “হুম্। তাতে শত্রুদের লাভ?”

জয়ন্ত বললে, “আমাদের পালাবার পথ বন্ধ হ'ল। হয়তো শত্রুরা এখনি আমাদের আক্রমণ করবে!”

সুন্দরবাবু বললেন, “হুম্। আমি এখন পায়ে হেঁটেই পালাতে চাই। এ বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তোমরা আসো আর নাইই আসো, এই আমি দৌড় মারলুম।”

সুন্দরবাবু সত্যসত্যই সকলের মায়া কাটিয়ে দৌড় দিলেন, কিন্তু জয়ন্ত এক লাফে তাঁর সুমুখে গিয়ে প'ড়ে বললে, “সুন্দরবাবু, একটু দাঁড়ান! বোধ হয় আমরাও আপনার সঙ্গী হ'তে বাধ্য হব!”

হঠাৎ পিছনে আর একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। মাটির উপরে ধুপ্ ধুপ্ ক'রে পায়ের শব্দ—যেন একদল সৈন্য তালে তালে পা ফেলে ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে!

জয়ন্ত বললে, “যা ভেবেছি তাই! ঐ ওরা আক্রমণ করতে আসছে! এখন পালানো ছাড়া উপায় নেই!”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নবাব

অনেক কষ্টে মাইলের পর মাইল পাহাড়ে-পথ পায়ে হেঁটে পা[illegible] হয়ে পরদিন তারা যখন লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছলো, তখন বেলা দুপুর। তাদের দুঃখের পাত্র পূর্ণ করবার জন্যে বৃষ্টি পড়ছে তখনো।

এবং সে-বৃষ্টি সে-দিন সে-রাত আর থামবার নাম করলে না।

লোকালয়ে পৌঁছে তারা প্রথমেই পেলে পুলিশের একটা ফাঁড়ি। জয়ন্ত ও মাণিক ছাড়া বাকি সকলের শরীরের অবস্থা হয়েছিল এমন ভয়ানক যে, ফাঁড়ির সামনে গিয়ে তারা একেবারে ভেঙে পড়ল। কাজেই জয়ন্ত ও মাণিক বাধ্য হয়ে তাদের নিয়ে ফাঁড়ির ভিতরেই প্রবেশ করল। তাদের অবস্থা দেখে, কাহিনী শুনে ও পরিচয় পেয়ে দারোগা পীর মহম্মদ সাহেব সকলকে যার-পর-নাই আদর-যত্ন করলেন এবং সেদিনকার মত তাদের ফাঁড়ির ভিতরেই থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

কাল্‌কের রাত্রের দুঃস্বপ্ন জয়ন্তের মত লোককেও আজ পর্য্যন্ত বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে রেখেছে! সে কী নিরেট অন্ধকার! যেন মুগুরের বাড়ি মারলে সশব্দে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়! সে কী দুর্য্যোগ! যেন ঝড় আর বৃষ্টি তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রেই উন্মত্ত ও নিষ্ঠুর আনন্দে আকাশ ও পৃথিবীকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল অশ্রান্ত ভাবে! সে কী বিভীষিকা! প্রেতাত্মা-জগতের সিংহদ্বার খোলা পেয়ে যেন মূর্ত্তিমান অভিশাপের দল সেদিন মানুষের জগৎ আক্রমণ করেছিল!

সেই মুহুর্মুহু নব নব ভয়-বিস্ময়ের অভিনয়-ক্ষেত্রে বৃষ্টির কন্‌কনে শীতলতায়, বজ্রসাথী ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ও ধাক্কায়, কখনো উপল-সঙ্কুল দুর্গম পার্ব্বত্য চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়ে, কখনো বর্ষাধারায় হঠাৎ-বেগবতী নদীর তীব্র স্রোত ঠেলে ঠেলে, কখনো তীক্ষ্ণ কাঁটাঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে প'ড়ে এবং কখনো বা ধূ-ধূ খোলা মাঠের তৃণহীন পিচ্ছল পাথুরে জমির উপর আছাড় খেয়ে তারা প্রাণপণে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করেছে—এবং তাদের পিছনে পিছনে বরাবর ধেয়ে এসেছে সে যে কারা কেউ তা জানেনা, কেবল তাদের কাণের কাছে একটানা সমান বেজে বেজে উঠেছে সেই মহা-অমানুষিক আশ্চর্য্য পায়ের শব্দ—একদল সৈন্য যেন সমতালে পা ফেলতে ফেলতে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে, ক্রমাগত এগিয়ে আসছে আর আসছে আর আসছে —সে ভয়াবহ পা-গুলো যেন থামতে জানেনা, যেন কখনো থামবেও না, যেন তারা চিরদিন ধ'রে এই মাটির পৃথিবীকে দলিত শব্দিত ও স্তম্ভিত ক'রে চ'লে চ'লে চ'লে বেড়াব !

উঃ! সে কথা ভেবে ভেবে জয়ন্ত এখনো থেকে থেকে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল!

জয়ন্তের দেহ লম্বায় ছয় ফুট চার ইঞ্চি, তার বুকের ছাতি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি চওড়ায় এবং তার ব্যায়ামপুষ্ট সুদীর্ঘ দেহকে দেখায় ঠিক দানবের দেহের মত! মাণিকের দেহ অতটা জাঁকালো দেখতে না হ'লেও যে-কোন পালোয়ানেরই মতন বলবান। কিন্তু তাদের এমন বলিষ্ঠ দেহও কালকের রাত্রের ব্যাপারে যথেষ্ট কাবু হয়ে পড়েছে। দলের অন্যান্য লোকদের কথা না তোলাই ভালো। তারা আজ শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তিশূন্য।

কিন্তু কে তারা এমন একতালে পা ফেলে ফেলে আসে? মাঝে মাঝে

বিদ্যুৎ-আলোতে কতকগুলো ধব্‌ধবে সাদা মূর্ত্তির মতন কি যেন দেখা গিয়েছে, কিন্তু সেটা চোখের ভ্রমও হ'তে পারে! এবং মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক হি হি হি হি হাসিও শোনা গিয়েছে! হাসেই বা কে, আর আসেই বা কারা? অনেক মাথা ঘামিয়েও জয়ন্ত কিছুই আন্দাজ করতে পারলে না।

আর-একটা জায়গায় তার মনে খট্‌কা লেগে রয়েছে! ভোরবেলায় পূর্ব্ব-আকাশে উষা যেই সিঁথায় সিঁদূরের রেখা টেনেছিল, কোথা থেকে বন-মুর্গী জাগরণের প্রথম ডাক ডেকে উঠেছিল, আব্‌ছা-আলো এসে অন্ধকারকে কাঁচের মতন স্বচ্ছ ক'রে তুলেছিল, অম্‌নি থেমে গিয়েছিল তাদের পিছনকার সেই একগুঁয়ে পায়ের শব্দগুলো! যারা তাদের আক্রমণ করেছিল তবে কি তারা রাত্রির রহস্যযাত্রী,—প্রভাতকে তারা ভয় করে?

কিন্তু এক বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই! জয়ন্ত জানে, সে ঠিক সূত্রই ধরেছে,—ঐ গোরস্থানে বা তার আশেপাশেই আছে সমস্ত রহস্যের মূল! ওখানে ভাসা-ভাসা যাদের দেখেছে এবং যাদের হাসি ও পায়ের শব্দ শুনেছে, নিশ্চয় তারাই হচ্ছে আসল পাপী ও অপরাধী। নইলে একটা পোড়ো সহরের পরিত্যক্ত গোরস্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সাধু ব্যক্তিরা লুকিয়ে রাত্রিবাস করতে আসে না, নইলে বাহির থেকে কেউ সেখানে এসেছে জেনে মোটরগাড়ী ভেঙে তার পালাবার পথ বন্ধ ক'রে দেয় না, নইলে অকারণে কেউ কারুকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় না!

আজ সকালে সে যদি ঘটনাস্থলে থাকতে পারত, তা'হলে কতটা সুবিধাই হ'ত! ওখানে নিশ্চয়ই আরো অনেক-কিছুই আবিষ্কার করা যেতে পারে

কিন্তু আজ আর ওখানে যাবার কোন উপায়ই নেই! তাদের গাড়ী দুখানা শত্রুর চক্রান্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, তার সঙ্গীদের গতরও চূর্ণ হয়ে

গেছে,—তার উপরে এই অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি !····· একটা মূল্যবান দিন মিথ্যা নষ্ট হ'ল !

লম্বা ঘরে পাশাপাশি ছয়খানা খাটিয়ায় জয়ন্ত, মাণিক, সুন্দরবাবু, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ আশ্রয় নিয়েছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে তাদের জন্যে চা এল, আর-সকলের সঙ্গে সুন্দরবাবুও নিতান্ত চা খাবার লোভেই নারাজ ভাবে উঠে বসলেন। কিন্তু পেয়ালায় প্রথম চুমুক্ দিতে গিয়েই তিনি ক'রে উঠলেন

জয়ন্ত বললে, "কি হ'ল সুন্দরবাবু ? হঠাৎ অমন ক'রে উঠলেন কেন ?"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "হুম্। অমন ক'রে উঠলুম কেন ? জেনে-শুনে ন্যাকা সাজা হচ্ছে ? মনে নেই, কাল পাহাড়ের উপর থেকে এই বুড়ো-বয়সে ডিগ্‌বাজি খেয়ে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গিয়েছিলুম ? এখনো চোয়াল নাড়বার যো নেই ?"

জয়ন্ত বললে, "ও ! আচ্ছা, এইবারে মনে থাকবে !"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমার পাল্লায় প'ড়েই তো আজ আমার এই দুর্দ্দশা ! দিব্যি সুখে ছিলুম, মরতে আমায় ভূতে কিললো, তাই তোমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছি। এ কী কাণ্ড রে বাবা ! ভূতে-মানুষে টানাটানি, নিতান্ত এখনো পরমায়ু আছে, তাই এত-বড় ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছি ! হুম্, কাল সকালেই আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব ! জয়ন্ত, মাণিক, তোমরাও বাঁচতে চাও তো আমার সঙ্গে চল ! অমিয়বাবু, আমি আপনাকে আগেই বলেছি, আর এখনো বলছি, আপনি শীগ্‌গির ভালো রোজা ডাকুন ! আপনার বোনকে উদ্ধার করা পুলিস কি সখের ডিটেক্‌টিভের কাজ নয় ! কুমারী শীলাকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে,—আপনি রোজা ডাকুন !"

কিন্তু অমিয় মোটেই সুন্দরবাবুর দামী উপদেশ শুনছিল না। সে এতক্ষণ চা পান করতে করতে জান্‌লা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল এবং হঠাৎ এখন চম্‌কে দাঁড়িয়ে উঠল! তারপর চায়ের পিয়ালাটা সশব্দে টেবিলের উপরে রেখেই ঝড়ের মতন বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

ঘরের ভিতরে ব'সে সকলে যখন সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করছে, তখন রাস্তা থেকে অমিয়ের উচ্চ চীৎকার শোনা গেল—"জয়ন্তবাবু! মাণিকবাবু! শীগ্‌গির আসুন—তাকে ধরেছি!"

ঘরের ভিতর থেকে সবাই ছুটে বাইরে গিয়ে পড়ল—এমন-কি সুন্দরবাবু পর্য্যন্ত তাঁর ডিগবাজি-খাওয়ার বিষম ব্যথা বেমালুম ভুলে গেলেন!

বাইরে বেরিয়েই দেখা গেল, একটা দীর্ঘাকার লোক অমিয়কে ধাক্কা মেরে পথের উপরে ফেলে দিলে—তারপর হন্‌-হন্‌ ক'রে এগিয়ে চলল! যে-রকম অনায়াসে অমিয়কে সে ভূতলশায়ী করলে, তাতে বেশ বোঝা গেল যে, তার শরীরে রীতিমত ক্ষমতা আছে! কিন্তু অমিয় তবু ভয় পেলে না বা তাকে ছেড়ে দিলে না, সে মরিয়ার মত পর-মুহূর্ত্তেই মাটি থেকে উঠে ছুটে গিয়ে আবার তাকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরলে! এবারে তার হাত ছাড়াবার আগেই আর সকলে গিয়ে লোকটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে!

অমিয় হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, "এই সেই লোকটা! যেদিন শীলা চুরি যায়, সেদিন একেই আমি ভাঙা মস্‌জিদের ভেতরে দেখেছিলুম! আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ডাকাতরা যখন আমাদের আক্রমণ করেছিল, তখন এই লোকটাই হা-হা ক'রে হেসেছিল! পথ দিয়ে আজ ফাঁড়ির দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে এ যাচ্ছিল, কিন্তু আমি দেখেই একে চিনতে পেরেছি!"

নিশীথ ও পরেশও একবাক্যে বললে, "হ্যাঁ, এই সেই লোক!"

জয়ন্ত লোকটার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলে। দীর্ঘ দেহ, ঘোর-কালো মুখের উপরে লম্বা লম্বা কালো চুলগুলো ঝুলে পড়েছে, পরোণেও কালো 'ওভারকোট' ও কালো পাজামা। তার তীক্ষ্ণ চোখদুটো দেখলেই গোখ্‌রো-সাপের চোখের কথা মনে হয়! সে-রকম চোখ কেউ কখনো দেখে নি বোধ হয়। সে চোখদুটোতে যেন পলক পড়ে না! তাদের ভিতর থেকে এমন একটা দুষ্ট ক্ষুধার ভাব ফুটে উঠছে যে, একবার দেখবার পর কেউ জীবনে আর কখনো সেই দুটো চোখকে ভুলতে পারবে ব'লে মনে হয় না!

দারোগা মহম্মদ সাহেবও গোলমাল শুনে এসে পড়েছিলেন। তিনি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি?"

—"হাজী নবাব আলি।"

—"এই বাবুদের তুমি চেনো?"

—"না। ওঁদের আমি কখনো দেখিনি, ওঁরা কি বলছেন তাও বুঝতে পারছি না।"

—"আলিনগরের ভাঙা মস্‌জিদে তুমি কি করতে গিয়েছিলে?"

—"জীবনে কোনদিন আমি আলিনগরেই যাই নি।"

অমিয় বললে, "মিথ্যাকথা!"

নবাবের সাপের মত চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কিন্তু মুখে সে শান্ত হাসি হেসে বললে, "আমি হাজী। মিথ্যা বলা আমার পাপ।"

মহম্মদ-সাহেব বললেন, "তুমি হাজীই হও আর কাজীই হও আর পাজীই হও, আজ তোমাকে ফাঁড়িতে বন্ধ থাকতেই হবে! এখন আমার সময় নেই, কাল সকালে তোমাকে ভালো ক'রে পরীক্ষা করব।"
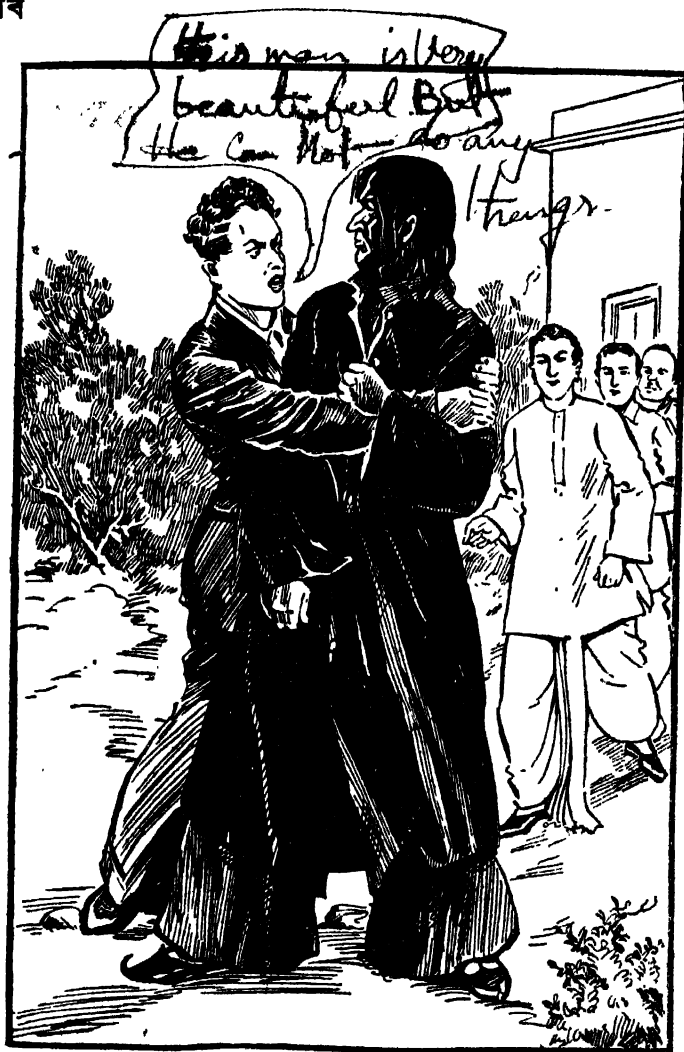
ছুটে গিয়ে আবার তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে

নবাবের চোখ আবার ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠল। সে বললে, "কোন্ আইনে আপনি আমাকে বন্ধ ক'রে রাখতে চান ?"

মহম্মদ সাহেব বললেন, "আইন ভাঙিয়ে যাঁরা খায় আইনের কথা তুমি সেই উকিলদেরই জিজ্ঞাসা কোরো। আমি উকিল নই,—আমি দারোগা। এই সেপাই ! একে নিয়ে যাও—"

* * * *

* * *

গভীর রাত্রে ঘুমন্ত সুন্দরবাবুর মনে হ'ল, কে যেন তাঁর কাণের কাছে হি-হি-হো-হো ক'রে অট্টহাসি হেসে উঠল !

জেগে বিছানার উপরে ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে সুন্দরবাবু চ্যাঁচাতে লাগলেন —"জয়ন্ত ! জয়ন্ত ! তারা এসেছে—তারা এসেছে— তারা এসেছে !"

সেই বিষম চীৎকারে ঘরশুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গেল !

জয়ন্ত বললে, "অত চ্যাঁচাচ্ছেন কেন সুন্দরবাবু, কী হয়েছে ?"

—"হুম্। আমার কাণের কাছে একটা বিদ্‌কুটে হাসি শুনলুম !"

—"পাগল নাকি ?"

বৃষ্টির জন্যে ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ ছিল। অমিয় আলো জ্বেলে বললে, "কই, ঘরে তো আর কেউ নেই !"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবুর ঘাড়ে স্বপ্নভূত চেপেছে !"

সুন্দরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ হে, হ্যাঁ ! তবু তো আমার ঘাড়ে স্বপ্নভূত চেপেছে, কিন্তু তোমাদের ঘাড়ে চেপেছে যে আসল ভূত, সে খেয়ালটা আছে কি ? হুম্, অট্টহাসিতে আমার কাণ গেল ফেটে, আমার ঘুম গেল ভেঙে, তবু ওঁদের বিশ্বাস হচ্ছে না !"

মাণিক একটা জান্‌লা খুলে দিলে। ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল হু-হু ক'রে জোলো-হাওয়া। বৃষ্টিপাতের শব্দে বাইরের অন্ধকার মুখরিত।

কিন্তু মাণিকের কাণ আর-একটা কিছু শুনলে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সমতালে পা ফেলে কারা চ'লে যাচ্ছে!

সে শব্দ জয়ন্তও শুনতে পেলে। তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সে গম্ভীর স্বরে বললে, "এস মাণিক!" এবং তারপরেই দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও তার পিছনে পিছনে চলল!

নবাব যে-ঘরে বন্দী ছিল, জয়ন্ত সিধে সেই ঘরের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের দরজা খোলা—ভিতরে নবাব নেই!

সুন্দরবাবু ব'লে উঠলেন, "ফুস্‌মন্ত্র, ফুস্‌মন্ত্র! ফুস্‌মন্ত্রে নবাব উড়ে গেছে, আর যাবার সময়ে ফুস্‌মন্ত্রেই আমার কাণের কাছে মুখ এনে হেসে গেছে!"

জয়ন্ত বললে, "ফুস্‌মন্ত্রের নিকুচি করেছে! এই দেখুন, দরজার তালায় চাবি লাগানো রয়েছে। বাইরে থেকে কেউ তালা খুলে নবাবের পালাবার সুবিধা ক'রে দিয়েছে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। কে সে? নিশ্চয়ই মানুষ নয়!"

জয়ন্ত বললে, "যদি কোন মূর্ত্তিমান অলৌকিক শক্তি এসে এই দরজা খুলতে চাইত, তাহ'লে কুলুপ আপনিই খুলে যেত, এর মধ্যে আবার চাবি ঢুকিয়ে কুলুপ খুলতে হ'ত না! যখন চাবির দরকার হয়েছে তখন বুঝতে হবে যে, আমাদেরই মত কোন রক্ত-মাংসের হাত এই দরজার কুলুপ খুলেছে'! আরো একটা ব্যাপার বেশ বোঝা যাচ্ছে। অমিয়বাবু ঠিক লোককেই

ধরেছেন। এই নবাব আলি যেইই হোক্, নিশ্চয়ই সে অপরাধীদের একজন। হয়তো সে-ই হচ্ছে দলপতি। নইলে এমন ক'রে পালিয়ে যেত না!"

নিশীথ বললে, "কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, ফাঁড়ির ভিতরে নবাবের পালাবার সাহায্য করলে কে?"

মাণিক বললে, "দরজার সামনে যে একজন চৌকিদার ছিল, সে কোথায় গেল?"

সুন্দরবাবু বললেন, "এও বুঝতে পারছ না? ফুস্‌মন্ত্রে উড়ে গেছে!"

জয়ন্ত লণ্ঠনটা মাথার উপরে তুলে এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখলে।

মাণিক এগিয়ে যেতে যেতে বললে, "উঠোনের ওপরে দেয়ালে ঠেসান্ দিয়ে ও কে ব'সে আছে?"

সেই চৌকিদার। মাণিক তার কাঁধে হাত দিতেই সে এলিয়ে একদিকে হেলে পড়ল।

মাণিক সচমকে বললে, "জয়, এ একেবারে ম'রে কাঠ হয়ে আছে। কিন্তু এর গায়ে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই!"

জয়ন্ত লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে চৌকিদারের মরা মুখ দেখেই স্তম্ভিত হয়ে গেল! তার ভুরুদুটো কপালের দিকে উঠে গেছে, তার চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে যেন বাইরে ঠিক্‌রে পড়তে চাইছে এবং তার মুখ হাঁ ক'রে আছে! মৃত মানুষের মুখে এমন ভীষণ ভয়ের চিহ্ন সে আর কখনো দেখে নি! সে যেন চোখের সামনে নরক-দৃশ্য দেখেই আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে মারা পড়েছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রান্তর-সমুদ্রে

খানিকক্ষণ পরে জয়ন্ত ধীরে ধীরে বললে, "হ্যাঁ, এ লোকটিকে কেউ
করে নি। কেবল ভয় পেয়েই এ মারা পড়েছে!"

মাণিক বললে, "ভেবে দেখ জয়, যা দেখলে মানুষ মারা পড়তে পা
সেটা কতদূর ভয়ানক দৃশ্য!"

সুন্দরবাবু বললেন, "এই চৌকিদার-বেচারা চোখের সামনে নিশ্চয় কে
আস্ত জলজ্যান্ত ভূত দেখেছিল!"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "আস্ত বা আধখানা, জ্যান্তো বা মরা—কো
রকম ভূত-টুৎই আমি বিশ্বাস করি না! চৌকিদার সত্যিই যদি কোন ভূ
দেখে থাকে তবে বুঝতে হবে যে, ভূতের ছদ্মবেশে সে কোন মানুষকে
দেখেছে!"

ইতিমধ্যে মহম্মদ সাহেব ও থানার অন্যান্য লোকেরাও গোলমাল শু
বেরিয়ে এসে ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন!

মৃত চৌকিদারের সেই ভয়বিকৃত ভয়ানক মুখ এবং বিস্ফারিত ও স্তম্ভি
দৃষ্টি আর তাকিয়ে দেখে সহ্য করা যাচ্ছিল না, একজন তাড়াতাড়ি গি
লাসের উপরে কাপড় চাপা দিলে!

মহম্মদ ভাবতে ভাবতে বললেন, "ঈশাক্ খুব সাহসী চৌকিদার ছি
সয়তানের সুমুখে গিয়েও সে বোধ হয় দাঁড়াতে ভয় পেত না! অথচ বে
বোঝা যাচ্ছে, বিষম ভয়েই তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে! তাকে এমন আশ্চর্য

। কারা দেখালে? নবাব ছিল ঘরের ভিতরে বন্ধ আর দরজার কুলুপের বি ছিল ঈশাকের পকেটে। কারা এসে সেই চাবি নিয়ে দরজা খুলে বাবকে খালাস ক'রে দিলে? বুঝতে পারছি, নবাবের একটা দল আছে। ন্তু তারা এর মধ্যে খবর পেলে কেমন ক'রে? আর তাদের দেখে ঈশাক্ই এতটা অসম্ভব ভয় পেলে কেন? সুন্দরবাবু, আপনি তো কলকাতা লিসের পুরাণো আর পাকা লোক, আজ্কের রহস্য কিছু বুঝতে রছেন কি?"

সুন্দরবাবু বিষণ্ণ ভাবে মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ম্। এর মধ্যে আর না-বোঝবার কি আছে? আমি তো গোড়া থেকেই ছি, এ-সব হচ্ছে ভৌতিক ব্যাপার! শীগ্গির রোজা না ডাকলে আমাদের াইকেই অম্নি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ম'রে থাকতে হবে!"

হঠাৎ মাণিক ব'লে উঠল, "আচ্ছা, এইমাত্র এখানেও তো আমরা তালে লে পা ফেলে কাদের চ'লে যেতে শুনেছি! কে তারা?"

গোলে-হরিবোলে জয়ন্তও এতক্ষণ সে কথাটা ভুলে গিয়েছিল! সেও ত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠল, "মাণিক, মাণিক! শীগ্গির আমাদের বন্দুকগুলো ানো! তারাই হচ্ছে নবাবের দল! মহম্মদ সাহেব, আর এক মিনিটও রি নয়—চলুন, আমরা তাদের পিছনে ছুটি,—তারা এখনো বেশীদূরে যাতে পারে নি!"

মহম্মদ নারাজ হ'লেন না। তখনি সশস্ত্র হয়ে সবাই থানা থেকে বেরিয়ে ড়ল।

মহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, "জয়ন্তবাবু, তাদের দলে কত লোক আছে?"

—"জানিনা। হয়তো ছ'-সাতজন, হয়তো আরো বেশী।"

—"তাদের দেখেই কি ঈশাক্ মারা পড়েছে ?"

—"হ'তে পারে।"

—"আপনি কি তাদের দেখেছেন ?"

—"দূর থেকে খালি কতকগুলো অস্পষ্ট সাদা সাদা মূর্ত্তি দেখেছি।"

সকলে একটা তে-মাথার উপরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তখনো ঝরছে সেই অশ্রান্ত বৃষ্টি এবং থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ অশান্ত ঝোড়ো-বাতাস। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘ থেকে অন্ধকারও যেন পৃথিবীর বুকে ঝর্-ঝর্ ক'রে ঝরছে ক্রমাগত। সেই জম অন্ধকারকে ছ্যাদা ক'রে পুলিসদের লণ্ঠনের আলো বেশীদূর অগ্রসর হ'ে পারছিল না।

মহম্মদ বললেন, "এইবারেই তো মুস্কিল। পথ গিয়েছে তিনদিকে, কি সেই বদমাইস্রা গিয়েছে কোন্ দিকে ?"

জয়ন্ত বললে, "এক কাজ করা যাক্। মহম্মদ সাহেব আর সুন্দরব যান সামনের দিকে। অমিয়বাবু, নিশীথবাবু আর পরেশবাবু যান বাঁদিকে আমি আর মানিক যাই ডানদিকে। সব দলেই জনকয় ক'রে চৌকিদ থাকুক।"

মহম্মদ বললেন, "এ ব্যবস্থা মন্দ নয়। যে-দল প্রথমে শত্রুর দেখা পা তখনি যেন তিনবার বন্দুক ছোঁড়ে। তাহ'লেই অন্য দু-দল তাদের সাহা করতে যেতে পারবে!"

জয়ন্ত ডানদিকের পথে দ্রুত পদচালনা ক'রে বললে, "এই কথা রইল!"

ডানদিকের পথ হচ্ছে আলিনগরে যাবার পথ। জয়ন্তের ধারণা, নবা

লবলে এই পথই ধরেছে। জয়ন্ত ও মাণিকের সঙ্গে রইল ছয়জন চৌকিদার।

জলমাখা অন্ধকারের গায়ে বার বার ধাক্কা খেতে খেতে দুটো লণ্ঠনের আলো অগ্রসর হচ্ছে এবং তারই পিছনে চলছে জয়ন্ত, মাণিক ও চৌকিদাররা। দুই ধারের ঘনবিন্যস্ত গাছপালার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেন বজ্রাগ্নিদগ্ধ বিনিদ্র রাত্রির যন্ত্রণাভরা একটানা দীর্ঘনিশ্বাস। চিরকাল যারা কালো রাত্রির সঙ্গী, সেই নিশাচর পেচক ও বাদুড়দেরও আজ দেখা নেই এবং শৃগালরাও আজ এই বীভৎস রাত্রের কালিমার চেয়ে গর্ত্তের অভ্যস্ত কালিমাকে নিরাপদ ভেবে শিকারের লোভ ছেড়ে বাসার ভিতরে ব'সে আছে। ঘ্যান্‌ঘেনে ঝিঁঝি-পোকাগুলোও মুখ বুঁজে যেন কোন অভাবিত অমঙ্গলের জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে!

বৃষ্টি, বাতাস ও তরুমর্ম্মর ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না!

জয়ন্ত এগুতে এগুতে বারংবার বলছে, "আরো তাড়াতাড়ি—আরো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল! তারা অনেকটা এগুবার সময় পেয়েছে, তবু তাদের ধরতে হবেই!" যে-দুনিয়ায় আজ কীটপতঙ্গের মত জীবেরও সাড়া নেই সেখানে মানুষের এই উৎসাহিত কণ্ঠস্বর কী অস্বাভাবিকই শোনাচ্ছে! তার গলার আওয়াজ শুনে গর্ত্তের ভিতরে ঘুমন্ত বন্য পশুরা সভয়ে চম্‌কে জেগে উঠতে লাগল!

লোকালয় পিছনে ফেলে তারা এখন একটা বনের ভিতরে এসে পড়েছে। মাণিক হতাশ কণ্ঠে বললে, "জয়, হয়তো তারা এ-পথে আসে নি!"

জয়ন্ত বললে, "অন্য দুটো পথের দিক থেকেও তো আমাদের কারুর

বন্দুকের আওয়াজ শুনছি না! তুমি কি বলতে চাও তারা কোন পথে না গিয়ে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হ'য়ে মিলিয়ে গিয়েছে? তুমিও কি ভূত মানো? যতক্ষণ না ওরা বন্দুক ছোঁড়ে, ততক্ষণ আমাদের এগিয়ে যেতে হবেই!"

—"কিন্তু যদি তারা এই বনে ঝোঁপেঝাপে কোথাও গা-ঢাকা দেয়? অন্ধকারে তাদের কি আর খুঁজে বার করতে পারব?"

—"সে মুস্কিলের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তবু থাম্‌লে আমাদের চলবে না! এগিয়ে চল—আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল!"

সারা বন যেন আজ বিভীষিকার মদে মাতাল হয়ে টলোমলো টলোমলো! বড় বড় গাছের ডালপাতার জালে বাধা প'ড়ে ঝোড়ো-হাওয়া কখনো করছে তীক্ষ্ণ স্বরে হাহাকার, কখনো করছে ভৈরব বিক্রমে ভীষণ গর্জ্জন! সেই সঙ্গে ছোট-বড় দমকা হাওয়ার দল গলা মিলিয়ে আরো যে কতরকম অদ্ভুত আওয়াজে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ ক'রে তুলছে, তা বর্ণনা করবার ভাষা কারুর কলমে নেই!

বন শেষ হ'ল—তারপরেই সকলে একটা মাঠের উপরে এসে পড়ল।

একজন চৌকিদার লণ্ঠনটা উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে সাম্‌নের দিকে দেখবার বৃথা-চেষ্টা ক'রে বললে, "হুজুর, মাঠে জল থৈ-থৈ করছে, পথ আর দেখা যাচ্ছে না!"

জয়ন্ত দৃঢ় স্বরে বললে, "জল ভেঙে এগিয়ে চল!"

—"কিন্তু কোন্ দিকে যাব? পথ কোথায়?"

—"সোজা চল!"

—"এই মাঠে যে খানা-ডোবা-পুকুর আছে! যদি কোন পুকুরে গিয়ে পড়ি?"

—"আমি তোমাকে টেনে আবার ডাঙায় তুলব! কিন্তু এগিয়ে চল—এগিয়ে চল!"

আর একজন চৌকিদার বললে, "হুজুব, এ মাঠে এখন কোমর-ভোর জল আছে, তার ওপরে এ হচ্ছে বানের জল—এর টানে আমরা ভেসে যেতেও পারি।"

জয়ন্ত বললে, "এই জল ভেঙে নবাব যখন তার দলবল নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছে, তখন আমরাই বা ভেসে যাব কেন?"

—"না হুজুর, নবাবরা নিশ্চয় এদিকে আসেনি।"

—"যদি এসে থাকে, তাহ'লে তারা ঐ বনের ভিতরেই লুকিয়ে আছে।"

জয়ন্ত ও মাণিক বুঝলে, চৌকিদাররা আর এক পা এগুতে রাজি নয়! আর তাদেরই বা দোষ কি? এই অন্ধকার, এই ঝড়ের দাপট, মাঠ দিয়ে এই বন্যার মত জলপ্রবাহ, এই অবিরাম বৃষ্টির কন্‌কনে ঝাপ্‌টা—যা তাদের হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত ভিজিয়ে স্যাঁৎসেতে ক'রে দিয়েছে! তার উপরে অজানা, ভয়ানক শত্রুর ভয় তো আছেই! আর, সে বড় যে-সে শত্রু নয়—কেবলমাত্র তাদেব স্বচক্ষে দেখেই সাহসী চৌকিদাব ঈশাক্ ইহলোক ছেড়ে পালিয়ে না গিয়ে পারেনি!

জয়ন্ত ও মাণিক দোমনা হয়ে অতঃপর কি করা উচিত তাই ভাবছে, এমন সময়ে দেখা গেল, সেই জলমগ্ন প্রন্তরের মাঝখানে নিবিড় অন্ধকারের গলায় দুলছে যেন একসার আলোর মালা!

জয়ন্ত চম্‌কে ব'লে উঠল, "ও কী ব্যাপার!"

চৌকিদাররা বললে, "আলেয়া!"

মাণিক বললে, "এতক্ষণ ও-আলোগুলো কোথায় ছিল?"

জয়ন্ত উচ্চৈস্বরে গুণলে, "এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়! মাণিক, মাণিক, আবার সেই ভয়ঙ্কর ছয়!"

—"তাহ'লে ওরাই হচ্ছে নবাবের সাঙ্গোপাঙ্গো! আঁধারে গা ঢেকে ওরা তো বেশ পালিয়ে যাচ্ছিল, মরতে আলো জ্বেলে আবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কেন?"

—"আর একটা কথা বুঝে দেখ মাণিক! আমাদের লণ্ঠনদুটো সমান জ্বলছে, এ আলো ওরা দেখেছে, আর নিশ্চয় বুঝেছে যে, আমরা ওদের ধরবার জন্যেই ছুটে এসেছি! সেটা বুঝেও ওরা আমাদের চোখের সামনেই আলো জ্বালতে ভয় পায় নি!"

—"তাহ'লে কি হঠাৎ ওদের দলে আরো অনেক নতুন লোক এসেছে? ওরা কি ভাবছে যে, আমাদের দেখে আর ভয় করবার দরকার নেই?"

—"ওরা কি ভাবছে তা কে জানে! এস, আগে আমরা তিনবার বন্দুক ছুঁড়ে আর সবাইকে জানিয়ে দি যে, শত্রুদের দেখা পাওয়া গেছে!"

জয়ন্ত ও মাণিক তিনবার বন্দুক ছুঁড়লে—তার তীব্র শব্দে চারিদিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল!

দূর থেকে আঁধার-রাত্রির বক্ষ ভেদ ক'রে আরো কয়েকটা বন্দুকের গর্জ্জন বাতাস-তরঙ্গের ভিতর দিয়ে শব্দ-তরীর মত ভেসে এল! বোঝা গেল, আর সবাই তাদের সঙ্কেত শুনেই সাড়া দিলে এবং শীঘ্রই তারা তাদের কাছে এসে হাজির হবে!

জয়ন্ত বললে, "আমরা কোথায় আছি, আলো জ্বেলে রেখে শত্রুদের সেটা আর দেখিয়ে দেবার দরকার নেই! লণ্ঠন দুটো নিবিয়ে ফেলো!"

কিন্তু ইতিমধ্যেই আর-একটা ব্যাপার আবিষ্কার ক'রে মাণিক উত্তেজিত

স্বরে ব'লে উঠল, "জয়, জয়! ওদের আলোগুলো যে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!"

সত্যই তাই! ছয়টা আলো দুলতে দুলতে জয়ন্তদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বললে, "আলো নেবাও, আলো নেবাও! ওরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে!"

চৌকিদাররা চট্‌পট্‌ আলো নিবিয়ে ফেললে।

তারপর ওদিককার আলোগুলো আসতে আসতে আবার থেমে পড়ল।

জয়ন্ত বললে, "এস, আমরা জলে নেমে খানিকটা এগিয়ে থাকি। আমাদের দলবল এসে পড়লেই আমরা ওদের আক্রমণ কবব। বন্দুক তৈরি রাখো, ওরা কাছে আসবার বা পালাবার চেষ্টা করলেই যথাসময়ে আমাদের আত্মরক্ষা বা আক্রমণ করতে হবে।"

জয়ন্ত ও মাণিকের সঙ্গে চৌকিদাররাও অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জলের ভিতরে নামল। জল কোথাও প্রায় কোমর পর্য্যন্ত, কোথাও তার চেয়ে কম।

আঃ, সেই অস্বাভাবিক বৃষ্টি—আকাশে এত জলও থাকতে পারে! সারা প্রান্তর যেন সমুদ্রের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হ'য়েছে এবং ঝড়ের উদ্দামতা তার মধ্যে রীতিমত তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করছে! ধারাপাতের রম্‌ঝম্‌ রম্‌ঝম্‌ ধ্বনির সঙ্গে জেগে আছে সেই সুবৃহৎ প্রান্তর-দীঘির পাগ্‌লা স্রোতের কল্‌কল্‌ কল্‌কল্‌ শব্দ! সে জলের কী প্রচণ্ড টান! প্রতি পদেই সকলকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে! তার উপরে রাত্রির কালো রং এত পুরু যে, প্রান্তরের মাঝে মাঝে যে গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে, একেবারে তাদের উপরে গিয়ে প'ড়ে ধাক্কা না-খাওয়া পর্য্যন্ত কারুর অস্তিত্ব জানবার উপায় নেই!

বহুদূরে ছয়টা আলো কালো শূন্যের কোলে কখনো দেখা দিচ্ছে, কখনো

"মাণিক, আবার সেই ভয়ঙ্কর হুয়!"

মিলিয়ে যাচ্ছে! জয়ন্তের মনে হ'ল, আলোগুলো যেন তাদের চেয়ে উঁচুতেই রয়েছে!

জয়ন্তই সকলের আগে-আগে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে পায়ের তলায় আর মাটি পেলে না এবং অতলের দিকে তলিয়ে গেল! তাড়াতাড়ি জলের উপরে ভেসে উঠে সে বললে, "হুঁসিয়ার! এখানে একটা পুকুর আছে!"

আন্দাজে আন্দাজে পুকুরের গভীরতা এড়িয়ে অন্যদিক দিয়ে তারা আবার অগ্রসর হ'তে লাগল।

মাণিক সভয়ে ব'লে উঠল, "আমার গায়ের উপর দিয়ে সাপের মত কি-একটা সাঁৎ ক'রে চ'লে গেল!"

জয়ন্ত বললে, "সাপের মত বলছ কেন মাণিক, ওটা সাপ ছাড়া আর কিছুই নয়!"

একজন চৌকিদার বললে, "এ-সময়ে মাঝে মাঝে মাঠের জলে কুমীররাও ভেসে আসে!"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, তারাও আর বাকি থাকে কেন? কেবল কুমীর নয়, আমি শুনেছি বানের জলে বাঘ-ভাল্লুকও বাধ্য হয়ে সাঁতার কাটে!"

ছয়টা আলো বেশ-খানিকটা কাছে এসে পড়েছে! সেগুলো এদিকে-ওদিকে নড়ছে বটে, কিন্তু অন্য কোনদিকে আর অগ্রসর হচ্ছে না।

জয়ন্ত বললে, "নবাব বোধহয় বুঝতে পেরেছে, আমরা তাদের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি! সে হয়তো দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে আছে!"

মাণিক নিজের বন্দুকটা আরো জোরে চেপে ধরলে!

আরো কিছুদূর এগিয়ে জয়ন্ত বললে, "নবাব খুব চালাক লোক বটে!

দেখছ মাণিক, আলোগুলো এখনো আমাদের কত উপরে নড়া-চড়া করছে ? এই মাঠের কোন-একটা উঁচু জায়গা নিশ্চয় দ্বীপের মত জলের উপরে জেগে আছে ! নবাব তার দল নিয়ে তারই উপরে উঠে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ! যুদ্ধ বাধ্‌লে আমাদেরই বিপদ !"

মাণিক ভাবতে লাগল, নবাবকে আজ তারা দেখেছে বটে, কিন্তু তার দলের লোকগুলো দেখতে কেমন ? অমিয় যে বর্ণনা করেছে, তাতে তো তাদের আকৃতি অমানুষিক ব'লেই মনে হয় ! চৌকিদার ঈশাকও তাদের চেহারায় অমানুষী কোন ভাব দেখে ভয়ে মারা পড়েছে ! এ রহস্যের কারণ কি ? কে তারা ?

এমন সময়ে পিছনে দুই-তিনবার বন্দুকের শব্দ হ'ল।

সকলে ফিরে দেখলে, পিছনে—যেদিক থেকে তারা এসেছে সেইদিকে অনেকদূরে চারটে আলো দেখা দিয়েছে !

জয়ন্ত ও মাণিক আবার তিনবার বন্দুক ছুঁড়ে নিজেদের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিলে, কারণ এই নতুন আলোগুলোর সঙ্গে আসছে যে তাদেরই বন্ধুরা, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই !

কিন্তু শত্রুদের আলোগুলো তখনো নিবে বা পালিয়ে গেল না।

জয়ন্ত বললে, "নবাব কি বুঝেছে তা সেইই জানে ! এত লোক দেখেও সে ভয় পেলে না ? না, বানের জলে তার পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই সে মরিয়া হয়ে আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে ?"

মাণিক চোখের সুমুখে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে, কতকগুলো ভৌতিক মূর্ত্তি দীর্ঘ দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে তাদের সকলকে এগিয়ে আসবার জন্যে সাগ্রহে আহ্বান করছে !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রক্তশূন্য মড়া

ঘুট্‌ঘুটে কালোর কোলে মিট্‌মিটে আলোর মালা! এতগুলো বন্দুকের আওয়াজ শুনেও মালাকররা মালা ছিঁড়ে পালিয়ে গেল না।

অথচ তারা এত কাছে এসে পড়েছে!

মাণিক বললে, "জলের ভিতরে নিশ্চয়ই একটা উঁচু জমি আছে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেই জমির উপরেই গাছপালার ভিতর থেকে যে ঐ আলোগুলো দেখা যাচ্ছে এটা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। জয়, ওরা হয় পাগল নয় মরিয়া! আমার মতে, আমাদের দল যখন সাড়া আর দেখা দিয়েছে, তখন তাদের জন্যে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে আক্রমণ করব।"

জয়ন্ত বললে, "তোমার পরামর্শ ই শুনব। আমাদের পূরোদলে থাকবে পঁচিশটা বন্দুক নিয়ে পঁচিশজন লোক। এদের নিয়ে দস্তুরমত একটা খণ্ড-যুদ্ধের আয়োজন করা যেতে পারে।"

তারা সেইখানে প্রায় বুক পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

এতক্ষণ পরে আকাশের বজ্র, মেঘের বৃষ্টি ও ঝড়ের রুদ্রগতি শান্ত ও ক্ষান্ত হবার চেষ্টা করলে। তারপর যখন সদলবলে মহম্মদ, সুন্দরবাবু, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে, তখন বজ্র, বৃষ্টি ও ঝড় পৃথিবীর কাছ

থেকে বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু অন্ধকারের নিবিড়তা ও প্রান্তর-সমুদ্রে বন্যার কলকল্লোল জেগে রইল আগেকার মতই।

সুন্দরবাবু এসেই জয়ন্তের সুবৃহৎ দেহের উপরে হেলে প'ড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব'লে উঠলেন, "বাস্ রে বাস্! চর্কীর মত ছুটোছুটি ক'রে এক মিনিট যে ব'সে একটু জিরিয়ে নেব তারও উপায় দেখছি না! এই অগাধ সাগরে ব'সে পড়লেই ডুবে যাব আর ডুবে গেলেই ভেসে যাব! হুম্!"

মাণিক বললে, "ভয় কি সুন্দরবাবু, ভেসে গেলে আপনি তো চিৎ-সাঁতার কাটতে পারবেন!"

সুন্দরবাবু ধমক দিয়ে ব'লে উঠলেন, "ঠাট্টা কোরোনা মাণিক, এ-সময়ে ঠাট্টা-ফাট্টা ভালো লাগে না!"

মহম্মদ বললেন, "জয়ন্তবাবু, ওগুলো নিশ্চয়ই শত্রুদের আলো?"

—"তাই তো মনে হচ্ছে। নইলে এই দুর্য্যোগে এখানে এসে দেয়ালী-উৎসব করবার সখ হবে কার?"

—"কিন্তু নবাবের আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! সে আলো জ্বেলে ব'সে আছে, যেন আমাদের কোন তোয়াক্কাই রাখে না!"

সুন্দরবাবু বললেন, "ভূত আবার কবে মানুষের তোয়াক্কা রাখে? মানুষ হ'লে ওরা এতক্ষণে বাপ্ বাপ্ ব'লে পালিয়ে যেত!"

মহম্মদ বললেন, "রাতও আর বেশী নেই, কথায় কথায় সময় কাটাবারও আর দরকার নেই। চলুন, আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে এগিয়ে যাই, ওদের একেবারে ঘিরে ফেলি!"

সকলে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সামনের উঁচু জমির দিকে এই অবস্থায় যতটা-সম্ভব

তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'ল। আলোগুলো তবু নেব্‌বার বা পালাবার চেষ্টা করলে না!

মহম্মদ বললেন, "এখান থেকে বন্দুক ছুঁড়ে আমরা অনায়াসেই ওদের মারতে পারি। আচ্ছা, একবার বন্দুক ছুঁড়ে ওদের ভয় দেখানো যাক্!"

মহম্মদ ও তাঁর দেখাদেখি আরো কেউ কেউ বন্দুক ছুঁড়লেন, ওদিক থেকে তবু কোন উত্তরই এল না, ফিরে এল খালি তাঁদের নিজেদেরই বন্দুকগর্জ্জনের প্রতিধ্বনি! এবং বেপরোয়া আলোগুলো তখনো অচল!

সুন্দরবাবু রেগে তিনটে হয়ে বললেন, "ওরা ভূতই হোক্ আর রাক্ষসই হোক্, ওদের আস্পর্দ্ধা আর আমি সইতে পারছি না! আমরা পুলিশের লোক—বিশেষ আমি হচ্ছি গিয়ে ক্যাল্‌কাটা পুলিসের লোক—আমাদের সঙ্গে চালাকি? আমি এইবার সত্যি-সত্যি ওদের হাতের আলো টিপ্‌ ক'রে গুলি ছুঁড়ব।"

সুন্দরবাবু লক্ষ্য স্থির ক'রে তুইবার বন্দুক ছুঁড়লেন। একটা আলো নিবে গেল, কিন্তু অন্য আলোগুলো তবু স'রে গেল না।

অমিয় বললে, "নাঃ, দেখছি ওরা এইবারে সত্যিই অবাক করবে, ওদের কি ভয়-ডর কিছুই নেই?"

মহম্মদ বললেন, "চল, আমরা সবাই এইবারে জমির ওপরে উঠে ওদের আক্রমণ করি!"

সুন্দরবাবু সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, "হুম্। মহম্মদ-সায়েব, আমার বোধহয় অন্ধকারে ওরা আমাদের জন্যে কোন ফাঁদ পেতে রেখেছে! ঐ আলো-গুলো হচ্ছে টোপ্‌। এগুলে বিপদ হ'তে পারে।"

মহম্মদ বললেন, "হ্যাঁ, হ'তে পারে। তবু আমি এগুব। চল সবাই, হুসিয়ার!"

সবাই অগ্রসর হ'ল।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, "মাণিক, আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে।"

—"কি?"

—"হয়তো আমরা এখনি নিরেট গাধা ব'লে প্রমাণিত হব।"

—"তার মানে?"

—"এই তো উঁচু জমির তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। মহম্মদ-সায়েব উপরে উঠে গিয়েছেন। আলোগুলো এখনো জ্বলছে। না, এ অসম্ভব!"

জয়ন্ত ও মাণিক পাশাপাশি থেকে জমির উপরে উঠতে লাগল। তখনো কোন শত্রু কি বীভৎস মূর্ত্তির সাড়া পাওয়া গেল না।

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল মহম্মদের। নীচে যারা ছিল তারা সবাই শুনলে, মহম্মদ বিপুল বিস্ময়ে চীৎকার ক'রে বলছেন—"কেউ এখানে নেই, কেউ এখানে নেই!"

তারপরেই সুন্দরবাবুর কণ্ঠস্বর: "হুম্! গাছের ডালে খালি লণ্ঠনগুলো ঝুলছে! আমাদের ভয়ে ভূতগুলো চম্পট দিয়েছে!"

উঁচু জমির উপরে জল ওঠেনি। বৃষ্টি-ভেজা জমির উপরে ব'সে প'ড়ে জয়ন্ত বললে, "মাণিক, পূর্ব্বদিকে মেঘের পর্দ্দা ছিঁড়ে গিয়েছে!"

মাণিক বললে, "কিন্তু এ কি-রকম ব্যাপার?"

জয়ন্ত পূর্ব্বাকাশের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত মৃদু স্বরে বললে, "প্রথম উষার স্বপ্নময় আলো ফুটছে। বর্ষা-প্রভাতে আলোকের নবজন্ম কি মধুর!"

সুন্দরবাবু এসে বললেন, "এখন তোমার কবিত্ব রাখো জয়ন্ত! নবাব কোন্‌দিকে গেল বল দেখি?"

—"যেদিকে রাত্রি গেছে সেইদিকে।"

—"কি বলছ হে?"

—"যারা রাত্রির অনুচর তারা প্রভাতের প্রতীক্ষা করে না। চেয়ে দেখুন, ঊষা এখন সিঁথায় সিঁদুর পরছে। মাণিক, ভৈরবরাগে এখন একটা ভজন গাইতে পারো?"

বন্ধুর মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে ভেবে জয়ন্তের মুখের দিকে মাণিক কট্‌মট্‌ ক'রে তাকিয়ে দেখলে।

জয়ন্ত হঠাৎ অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সুন্দরবাবু ভয় পেয়ে দুই পা পিছিয়ে গেলেন। তিনিও ঠাউরে নিলেন, জয়ন্ত পাগল হয়ে গিয়েছে, হয়তো এখনি সে তাঁকে কামড়ে দেবে!

মহম্মদ আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "জয়ন্তবাবু, এত হাসছেন কেন? এই কি হাসবার সময়?"

জয়ন্ত হাসতে-হাসতেই বললে, "বলেন কি মহম্মদ-সাহেব! এত-বড় প্রহসনেও হাসব না? ঐ লণ্ঠনগুলো আলো নয়, আলেয়ার মতই আমাদের বিপথে চালনা ক'রে সাত ঘাটের জল খাইয়ে কাদা ঘাঁটিয়ে এখানে এনে ফেলেছে! বুঝেছেন? নবাব আমাদের চেয়ে ঢের-বেশী চালাক! সে অন্ধকারে গাছের ডালে এই লণ্ঠনগুলো ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছে কেবল আমাদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে!"

—"অর্থাৎ—"

—"অর্থাৎ আমরা যখন আলোর দিকে ছুটে আসব, তারা তখন অন্যদিকে

ছুটে পালিয়ে কলা দেখাবার সময় পাবে। বাহাদুর নবাব, বাহাদুর! কাজেই এখন প্রভাতের সূর্য্যোদয় দেখা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার নেই!"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমি ঐ হতভাগা সূর্য্যোদয় দেখতে চাই না।"

—"তাহ'লে কি করবেন?"

—"আমি এখন ঘুমোতে চাই।"

—"তাহ'লে ঘুমিয়ে পড়বার আগে নবাবের নামে একবার জয়ধ্বনি দিন!"

—"হুম্। নিজের মুখে চুণকালি মাখিয়ে শত্রুর নামে জয়ধ্বনি দেবার ইচ্ছে আমার নেই।"

—"কিন্তু সুন্দরবাবু, আমার ওটুকু উদারতা আছে। আমাদের মত এতগুলো মাথাকে যে পাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল, সে অসাধারণ ব্যক্তি! এমন-ধারা অসাধারণ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে নেমে যদি কেল্লা ফতে করতে পারেন, তাহ'লে সেই জয়ই হবে অতুলনীয়! এতদিন পরেই তো খেলা জ'মে উঠল! এখন দেখা যাক্ কে হারে কে জেতে!"

উপর-উপরি বিষম কর্ম্মভোগের পর প্রায় সকলেরই শরীরের অবস্থা হ'ল এমন শোচনীয় যে, তার পর দিন কেউ আর বিছানা থেকে উঠবার নাম করলে না।

তার পরের দিনের রাত্রি প্রভাত হ'লে পর মাণিক বিছানা থেকে উঠে দেখলে জয়ন্তের শয্যা শূন্য! সে কখন্ উঠে বেরিয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবাবুও তখন গাত্রোত্থান ক'রে দাড়ী কামাতে ব'সে গিয়েছেন।

এমন সময়ে মহম্মদ এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

মাণিক সুধোলে, "কি মহম্মদ-সায়েব, এর মধ্যে নবাবের আর কোন খবর পান নি ?"

তিনি বললেন, "না। কিন্তু এখানকার এক মুসলমান দোকানীর একটি মেয়ে চুরি গিয়েছে !"

মাণিক উত্তেজিত স্বরে বললে, "আবার মেয়ে-চুরি !"

—"হ্যাঁ। কিন্তু এবারে কেবল মেয়ে-চুরি নয়, সঙ্গে সঙ্গে খুন !"

সুন্দরবাবু চম্‌কে উঠে দাড়ীর উপরে ক্ষুরের কোপ্ বসাতে বসাতে ভারি সাম্‌লে গেলেন।

মহম্মদ বললেন, "কাল রাত্রে দোকানী বাসায় ছিল না। ঘরের ভিতরে তার প্রৌঢ়া স্ত্রী আর সতেরো বছরের মেয়ে ঘুমোচ্ছিল। গভীর রাত্রে পাড়ার লোকে শুনতে পায়, দোকানীর ঘরের ভিতর থেকে মেয়ে-গলায় চীৎকার হচ্ছে। পাড়ার লোক যখন বাইরে বেরিয়ে আসে চীৎকার তখন থেমে গেছে। কিন্তু চীৎকারের বদলে তারা তখন আর একটা শব্দ শুনতে পেলে। কারা যেন সমতালে পা ফেলে অন্ধকারে গা ঢেকে চ'লে যাচ্ছে। এই পায়ের শব্দের কথা এখন এ-অঞ্চলের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই শব্দ শুনেই পাড়ার লোকের সমস্ত সাহস উপে যায়,—সকলে আবার যে যার ঘরে ঢুকে খিল্ এঁটে দেয়। আজ সকালে উঠে সবাই দোকানীর ঘরে ঢুকে দেখে, তার মেয়ে অদৃশ্য, আর তার বউ ম'রে কাঠ হয়ে মেঝের উপরে প'ড়ে রয়েছে !"

সুন্দরবাবু ক্ষুর নামিয়ে ঘুরে ব'সে বললেন, "হুম্। আধখানা দাড়ী, আমি পরে কামাব, আগে সব গল্পটা শুনে নি !"

ভারি সাম্‌লে গেলেন

মহম্মদ বললেন, "খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলুম। ভয়ানক দৃশ্য! একটি আধবয়সী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, আর তার আতঙ্ক-ভরা চোখ-মুখ দেখে আমার ঈশাক-বেচারীর মুখ মনে প'ড়ে গেল! ঈশাকের মুখে-চোখেও ঠিক এই রকম বীভৎস ভয়ের ভাব মাখানো ছিল। স্ত্রীলোকটির গলায় একটা মস্ত ছ্যাঁদা, কিন্তু ঘরের কোথাও রক্তের একটুও চিহ্ন নেই। অথচ তার দেহ একেবারে সাদা, যেন সমস্ত রক্তই সেই গলার ছ্যাঁদা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে! ঘরের কোথাও রক্ত নেই, দেহেও রক্ত নেই—অথচ গলায় অত-বড় ছ্যাঁদা! আমি তো হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছি!"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমি বরাবরই বলছি এ-সব ভুতুড়ে কাণ্ড, তা তোমরা কেউ তো আমার কথায় কাণ পাতবে না!"

মহম্মদ বললেন, "তা যদি হয়, তবে এ-সব কাণ্ডের সঙ্গে নবাবের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ নবাবকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলুম,—সে আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের মানুষ।"

নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে অমিয়ও সব শুনছিল। এখন সে উঠে ব'সে বললে, "কিন্তু আলিনগরে যে-ছয়টা মূর্ত্তি তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করেছিল, আমাদের বন্দুকের গুলিও যাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে নি, তাদের চেহারাও ছিল অবিকল সাধারণ মানুষের মত!"

পরেশ ও নিশীথও উঠে ব'সে বললে, "আমরাও এ-কথায় সায় দি।"

মহম্মদ বললেন, "সমস্ত ব্যাপারই রহস্যময়। নবাব কেমন ক'রে পালাল? কে তার ঘরের দরজা খুলে দিলে? ঈশাক কেন মারা পড়ল? পশুর্ রাত্রে গাছের ডালে আলো ঝুলিয়ে কারা আমাদের চোখে ধূলো দিলে?

কারা মেয়ে চুরি করে? কেন করে? পাড়া জাগিয়ে কারা তালে তালে পা ফেলে চ'লে যায়? এ-সব প্রশ্নের কোন জবাব নেই। আমি স্থির করেছি, আজই সদরে রিপোর্ট পাঠিয়ে সাহায্য চাইব।"

অমিয় বললে, "কিন্তু এই সব রহস্যেরই মূল আছে সেই আলিনগরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে।"

মহম্মদ বললেন, "বেশ, সদর থেকে সাহায্য পেলে আমরা সদলবলে আলিনগরেও গিয়ে হাজির হ'তে পারব!"

এমন সময়ে জয়ন্ত ফিরে এল। তার গম্ভীর মুখে চিন্তার রেখা।

সুন্দরবাবু ব'লে উঠলেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত! ভয়ানক খবর!"

জয়ন্ত ভুরু কুঁচকে সুন্দরবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, "এমন কি ভয়ানক খবর থাকতে পারে, যা আমি জানিনা?"

—"হুম্! এবারে মেয়ে-চুরির সঙ্গে মেয়ের মা খুন!"

—"আমি জানি। এইমাত্র ঘটনাস্থল থেকেই ফিরে আসছি।"

—"মহম্মদ-সায়েব সদর থেকে সাহায্য আনিয়ে আলিনগর আক্রমণ করবেন।"

—"কবে মহম্মদ-সায়েব?"

—"দিন-চারেক পরে।"

জয়ন্ত আর কিছু না ব'লে মাণিককে ইসারা ক'রে আবার ঘরের বাইরে গেল।

মাণিক তার কাছে গেলে পর জয়ন্ত বললে, "আমি আরো দিন-চারেক অপেক্ষা করতে পারব না। বিশেষ, এত লোকজন নিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে আলিনগরে গেলে আসামীরা সাবধান হয়ে পালাতে পারে।"

—"তুমি কি করতে চাও ?"

—"তুমি আর আমি কাল রাত থাকতে উঠে চুপিচুপি আলিনগরে যাত্রা করব।"

—"সে কি, পায়ে হেঁটে ? আলিনগর যে এখান থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে !"

—"না, এখানে আমার পরিচিত এক জমিদার-বন্ধু আছেন শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। তিনিই মোটর দেবেন। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়, তুমি-আমি দুজনে লুকিয়ে যেতে পারব। আগে নিজেরা খোঁজ নিয়ে আসি, তারপর দরকার হ'লে মহম্মদ-সায়েবের সাহায্য নেব। মাণিক, আজ যে অমানুষিক কাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছি, তারপর আর এখানে হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষা করা চলে না! সেই রক্তশূন্য মড়ার মুখ চিরদিন আমার মনে থাকবে! গলার ছ্যাঁদা দিয়ে নিশ্চয় রক্তের ঝরণা ঝ'রেছিল, কিন্তু সে রক্ত কোথায় গেল ? আর তার গলার ক্ষতটা কি-রকম দেখতে জানো মাণিক ? যেন কোন রক্তলোলুপ জন্তু ধারালো দাঁত দিয়ে তার গলা কাম্‌ড়ে ধ'রেছিল—আর তার দেহের সমস্ত রক্ত সেইই প্রাণপণে শুষে পান ক'রে ফেলেছে !"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেতের প্রতিহিংসা

ভোর-বেলায় মোটর ছুটে চলেছে আলিনগরের দিকে।

জয়ন্ত গাড়ীর 'হুইল' ধ'রে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বললে, "মাণিক, মাঠে মাঠে আর পথের মাঝে মাঝে দেখছি এখনো মন্দ জল জ'মে নেই। আমরা বেলা ত্নটো-আড়াইটের আগে আলিনগরে গিয়ে পৌঁছতে পারব ব'লে মনে হচ্ছে না।"

মাণিক বললে, "কিন্তু আমরা ত্নজনে আলিনগরে গিয়ে কি করব? সেখানে তুমি কী দেখবার আশা কর?"

—"তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে: গোয়েন্দার কাজ দল বেঁধে চলে না। তাতে শত্রুরা সাবধান হবার সুযোগ পায়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, প্রথম দিনেই আমাদের দলে যদি বেশী লোক না থাকত, তাহ'লে এতক্ষণে সমস্ত রহস্য হয়তো আমরা আবিষ্কার ক'রে ফেলতে পারতুম। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে: আলিনগরে গিয়ে যে কি দেখব, সেটা আমি নিজেই জানি না। গত পশু´ পর্য্যন্ত এই রহস্য সম্বন্ধে আমার যে-ধারণা ছিল, গেল-কাল সকালে সেই রক্তহীন মৃতদেহ দেখবার পর থেকে সে-ধারণা একেবারেই বদ্‌লে গেছে। মাঝে মাঝে এখন মনে হচ্ছে, হয়তো সুন্দরবাবুর সন্দেহই সত্য, হয়তো এই-সব মেয়েচুরির মধ্যে অলৌকিক কোন ব্যাপারই আছে!"

মাণিক চকিত কণ্ঠে বললে, "অলৌকিক বলতে তুমি কি বুঝেছ? ভৌতিক ব্যাপার?"

জয়ন্ত বললে, "ভূত বলতে লোকে যা মানে, আমি তা মানি না। ভূতে বেছে বেছে খালি মেয়ে চুরি করবে কেন? তবে ভূতে যে মানুষ চুরি করে এমন একটা বিলাতী গল্প আমি প'ড়েছিলুম। আলিনগর এখন অনেক দূরে। সময় কাটাবার জন্যে তুমি যদি সেই গল্পটা শুনতে চাও, আমি বলতে রাজি আছি। কিন্তু মনে রেখো, এটা গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।"

মাণিক মোটরের একটা কোণ নিয়ে আরাম ক'রে ব'সে বললে, "বল।"

জয়ন্ত গাড়ীর গতি একবার থামিয়ে, রূপোর শামুকের ভিতর থেকে এক টিপ্ নস্য নিয়ে নাকে গুঁজে গল্প আরম্ভ করলে:

লণ্ডন সহরের পথ। শীতার্ত্ত রাত্রি। একখানা বাস ছুটেছে—আজকের মত এই তার শেষ যাত্রা। বাসের ভিতরে নীচের তালায় লোকজন বেশী নেই।

দোতালায় কেউ উঠেছে ব'লে কণ্ডাক্টরের মনে হ'ল না। তবু একবার নিশ্চিত হবার জন্যে সে বাসের দোতালায় গিয়ে উঠল।

সামনের আসনে একজন আরোহী!

কণ্ডাক্টরের বিস্ময়ের সীমা রইল না! এই যাত্রীটি তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কখন্ উপরে উঠে ব'সে পড়েছে?

যাত্রী মাথার টুপীটা মুখের উপরে টেনে নামিয়ে দিয়েছে এবং 'মাফ্লার' ও কোটের কলার দিয়ে মুখের নীচের দিকটা ঢেকে ফেলেছে—শীতের হাড়-

কাঁপানো হাওয়ার চোট্ সামলাবার জন্যে। স্থির ভাবে ব'সে যেন আড়
হয়েই সে সামনের দিকে তাকিয়েছিল।

বোধ হয় সে কণ্ডাক্টরের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। কারণ সে দু
আঙুলে একটি আনী ধ'রে হাত বাড়িয়ে ব'সে আছে!

কণ্ডাক্টর বললে, "ওঃ, ভারি ঠাণ্ডা রাত মশাই!"

যাত্রী জবাব দিলে না।

—"কোথায় যাবেন?"

—"ক্যারিক্ ষ্ট্রীট।"

যাত্রীর উচ্চারণ অদ্ভুত। কণ্ডাক্টর আবার সুধোলে, "কোথায় যাবে
বললেন?"

—"ক্যারিক ষ্ট্রীট—ক্যারিক্ ষ্ট্রীট—"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি জানি—অতবার আর বলতে হবে না!"—
ব'লেই কণ্ডাক্টর যাত্রীর হাত থেকে আনীটা টেনে নিলে।

যাত্রী একটুও না ফিরে বললে, "জানো? কী জানো, তুমি?"

কিন্তু কণ্ডাক্টরের বুকের ভিতর পর্য্যন্ত তখন শিউরে-শিউরে উঠছে
আনীটা কি অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! যেন সেটাকে জমাট বরফের ভিতর থে
টেনে বার করা হয়েছে!

টিকিট কেটে কণ্ডাক্টর যাত্রীকে হাত বাড়িয়ে দিতে গেল।

যাত্রী বললে, "যেখানে আনী ছিল টিকিটখানা সেইখানে গুঁজে দাও।"

কেন তা সে জানে না, কিন্তু কণ্ডাক্টরের ইচ্ছা হ'ল না যে যাত্রীর হা
হাত দেয়। তার হাতখানা আড়ষ্ট, বোধ হয় পক্ষাঘাতে পঙ্গু। টিকিটখা
কোনরকমে গুঁজে দিয়ে কণ্ডাক্টর বললে, "কেমন, পেয়েছেন জগন্নাথ-মশাই

তাকে ঠুঁটো জগন্নাথ ব'লে কৌতুক করা হচ্ছে ভেবেই বোধ হয় যাত্রী বললে, "তুমি আর আমার সঙ্গে কথা কয়ো না।"

—"কে কথা কইতে চায়" ব'লে কণ্ডাক্টর নেমে গেল।

বাস ক্যারিক ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে থামল। কণ্ডাক্টর চ্যাঁচাতে লাগল—ক্যারিক্ ষ্ট্রীট! ক্যারিক্ ষ্ট্রীট!"

কিন্তু দোতালা থেকে আড়ষ্ট যাত্রী নামবার নাম করলে না।

কণ্ডাক্টর আপন মনে বললে, "ও যদি সারারাত টঙে ব'সে থাকতে চায়, কুক্! আমি আর ওপরে উঠছি না!......এও হ'তে পারে, হয়তো কখন নেমে গিয়েছে, আমি দেখতে পাইনি।"

* * *

সেই দিন সন্ধ্যাতেই ক্যারিক্ ষ্ট্রীটের একটি হোটেলের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল একখানা ট্যাক্সি।

ট্যাক্সি থেকে মোটমাট নিয়ে যে ভদ্রলোকটি নামলেন তাঁর নাম মিঃ রাম্‌বোল্ড্। কয়েক বছর আগে তিনি এই হোটেলেই ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। তারপর অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। এত-কাল পরে আবার তাঁর পুরাণো হোটেলে ফিরে এলেন।

হোটেলের কর্ত্তা তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করতে এলেন।—"এই যে মিঃ রাম্‌বোল্ড্! জানি, ব্যবসায়ে লক্ষ্মীলাভ ক'রে আবার আপনি আমাদের কাছেই ফিরে আস্‌বেন!"

মিঃ রাম্‌বোল্ড্ হাসিমুখে বললেন, "হ্যাঁ, আমি লক্ষ্মীলাভ করেছি। আজ আমি মস্ত ধনীই বটে!"

হোটেলের কর্ত্তা বললেন, "কিন্তু তবু আপনি যে আমাদের মত গরীবদে, ভোলেন নি, এইটেই যথেষ্ট !"

—"কি ক'রে ভুলব ? এ হোটেল যে আমার নিজের বাড়ীর মত প্রিয়। এখানকার পুরাণো চাকর ক্লুটসাম্ কোথায় ! এখানেই কাজ করে ? বে বেশ, তাকেই আমি চাই !"

রাত্রে মিঃ রাম্‌বোল্ড্ নিজের ঘরে ব'সে ক্লুটসামের সঙ্গে কথা কইছিলেন। ক্লুটসাম জিজ্ঞাসা করছিল, "আচ্ছা হুজুর,অষ্ট্রেলিয়া দেশটা কেমন ?"

—"ভালোই।"

—"সেখানকার আইন বোধ হয় এখানকার মত কড়া নয় ?"

—"কি-রকম ?"

—"ধরুন, আপনি যদি সেখানে কোন মানুষ খুন করেন, তাহ'লে পুলি আপনাকে ধ'রে ফাঁসি দেবে তো ?"

মিঃ রাম্‌বোল্ড্ অত্যন্ত-বেশী চম্‌কে উঠলেন। শুক্‌নো গলায় থতোমতো খেয়ে বললেন, "আমিই বা মানুষ খুন করব কেন, আর আমাকেই বা ফাঁ দেবে কেন ?"

—"না হুজুর, আমি কথার কথা বলছি ! বাপ্‌রে, মানুষ খুন করার ক বিপদ ! পুলিস ফিরবে পাছে পাছে—"

রাম্‌বোল্ড বাধা দিয়ে জোরে জোরে বললেন, "কেন, পুলিস পা ফিরবে কেন ? যদি আমি কারুকে খুন করি, তার লাস লুকিয়ে ফেলি, বে সাক্ষী না থাকে, তাহ'লে পুলিস জানতে পারবে কেমন ক'রে ?"

—"কিন্তু হুজুর, যাকে খুন করেছেন সে যদি ভূত হয় ? প্রতিশো নেবার জন্য আপনাকে খুঁজতে আসে ?"

রাম্‌বোল্ডের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, "থামো, থামো!"

ক্লুটসাম্‌ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "ওকি হুজুর, আপনি অমন করছেন কেন? আমি কথার কথা বলছি!"

—"আমার গলা শুকিয়ে গেছে! শীগ্‌গির এক গেলাস জল আনো!"

ক্লুটসাম্‌ তখনি জল এনে দিলে। রাম্‌বোল্ড জল পান ক'রে অন্য কথা পেড়ে বললেন, "আচ্ছা ক্লুটসাম্‌, তোমাদের হোটেল এখন কেমন চলছে?"

—"খুব ভালো চলছে হুজুর! এই আজকের কথাই ধরুন না! আজ রাত্রে যদি কেউ এসে ডবল টাকাও দিতে চায়, তাহ'লেও তাকে আমরা ঘর দিতে পারব না। হোটেলের কোন ঘরই খালি নেই।"

—"ক্লুটসাম্‌, দেখছ আজকের রাত কি ঠাণ্ডা? বাইরে বরফ পড়ছে। আজ কোন বেচারী যদি এখানে এসে ঘর না পায়, তাহ'লে তার কষ্টের আর সীমা থাকবে না! আমার তো দুটো ঘর, দুটো বিছানা। আজ যদি সত্যিই কেউ আসে, তাকে তাড়িয়ে দিও না, অন্তত আজকের জন্যেও তাকে আমি আমার একটা বিছানা ছেড়ে দিতে রাজি আছি।"

—"আচ্ছা হুজুর!"

*

মাঝ-রাত্রি। দেউড়ীর ঘণ্টাটা হঠাৎ খুব-জোরে খুব-তাড়াতাড়ি বেজে উঠল—একবার, দুইবার, তিনবার!

হোটেলের দ্বারবান অবাক হয়ে ভাবলে, এই তুষার-ঝরা নিশুত রাতে কে অতিথি বাইরে থেকে এল!

আবার সেইরকম খুব-জোরে আর খুব-তাড়াতাড়ি তিনবার ঘণ্টাধ্বনি!

দ্বারবান বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে দেউড়ীতে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

ভিতরে এসে দাঁড়াল এক অদ্ভুত মূর্ত্তি! তার মাথার টুপিটা মুখের উপর টেনে নামানো, আর গলার কলারটা টেনে চিবুকের উপরে তুলে দেওয়া। সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা মস্ত-বড় ঝলঝলে এক কালো মিশ্‌মিশে ওভার-কোটে। ওভার-কোটের এক-দিকটা ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে—বোধ হয় তার হাতে একটা বড় চুপড়ী কিম্বা একটা ব্যাগ আছে।

দ্বারবান বললে, "সেলাম হুজুর! আপনার কি দরকার?"

আগন্তুক কোন জবাব না দিয়ে এক কোণে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বললে, "আমি আজকের রাতের জন্যে হোটেলে একখানা ঘর চাই।"

—"হুজুর, আজ যে হোটেলের সব ঘর ভর্ত্তি হয়ে গেছে!"

—"তুমি কি ঠিক জানো?"

—"হ্যাঁ হুজুর!"

—"কিন্তু ভালো ক'রে ভেবে দেখ।"

—"ভালো ক'রে ভাববার দরকার নেই হুজুর! আমি জানি।"

আগন্তুক এতক্ষণে মুখ তুলে দ্বারবানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "আর একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখ দেখি!"

কেন, তা সে জানে না, কিন্তু দ্বারবানের মনে হ'ল, তার দেহের ভিতর থেকে যেন কি-একটা জিনিষ—হয়তো তার জীবনই—ঠেলে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে! সে ভয়ানক ভয় পেয়ে ব'লে উঠল, "দাঁড়ান হুজুর! আমি জেনে এসে বলছি!"

সে হোটেলের ভিতর-দিকে চ'লে গেল। কিন্তু খানিক পরে খবর নিয়ে ফিরে এসে আগন্তুককে আর দেখতে পেলে না! কোথায় গেল সে? হোটেলের ভিতরে, না বাইরে?

হঠাৎ তার চোখ পড়ল আগন্তুক যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখানটায়। সেখানে মেঝের উপরে লম্বা একটুক্‌রো বরফ প'ড়ে চক্‌চক্‌ করছে।

তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না! চারিদিক ঢাকা, তবু এখানে বরফ এল কেমন ক'রে?

সেই কন্‌কনে শীতের রাতেও দ্বারবানের কপালের উপরে ঘামের ফোঁটা দেখা দিলে! রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নিজের মনেই সে বললে, "যাকে এইমাত্র দেখলুম, কে সে? মানুষ?"

দোতালার হল-ঘরে দাঁড়িয়ে ক্লুট্‌সাম্ দেখলে, সিঁড়ি দিয়ে এক অচেনা ভদ্রলোক নিঃশব্দে উপরে উঠে আসছেন।

এগিয়ে এসে বললে, "কে আপনি? কাকে চান?"

—"তুমি মিঃ রাম্‌বোল্ডকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস, আজ রাত্রে তাঁর অন্য বিছানাটা আমি ব্যবহার করতে পারব কিনা?"

ক্লুট্‌সাম্ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আগন্তুকের মুখের পানে তাকালে। মিঃ রাম্‌বোল্ডের বাড়তি বিছানার কথা এই অচেনা লোকটি কেমন ক'রে জানতে পারলে? কিন্তু সে কথা নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা না ঘামিয়ে সে আগন্তুকের অনুরোধ রাখবার জন্যে ভিতর দিকে চ'লে গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে বললে, "মিঃ রাম্‌বোল্ড আপনার নাম জানতে চাইলেন!"

আগন্তুক পকেট থেকে বার করলে, খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া একটুকরো কাগজ। সেই কাগজের টুক্‌রোটা এগিয়ে দিয়ে সে বললে, "মিঃ

"আপনার কি দরকার ?"

রাম্‌বোল্ডকে এটা দিয়ে এস। আর তাঁকে জানিয়ো আমার নাম হচ্ছে, জেমস্ হাগ্‌বার্ড্।”

ক্লুট্‌সাম্ সেই কাগজখানা পড়তে পড়তে আবার হোটেলের ভিতর-দিকে চ’লে গেল। তাতে লেখা রয়েছে—

“অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি সহরের মিঃ জেমস্ হাগ্‌বার্ড্ কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলেন, এতদিন সে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সংপ্রতি একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। বন্দুকের গুলিতে তিনি মারা পড়েছেন। এখন প্রকাশ পেয়েছে, মিঃ রাম্‌বোল্ড্ নামে তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে তিনি ঐ জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু সেইদিন থেকে মিঃ রাম্‌বোল্ডেরও আর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।”

একটু পরে ক্লুট্‌সাম্ আবার ফিরে এল। তারপর তফাতে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, “মিঃ রাম্‌বোল্ড বললেন—আপনি নরক থেকে এসেছেন, আবার নরকেই বিদায় হোন!”—এই ব’লেই সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল!

মিনিট-পাঁচেক পরেই রাম্‌বোল্ডের ঘর থেকে ভেসে এল ঘন ঘন বিষম আর্ত্তনাদ ও ভীষণ গর্জ্জন-ধ্বনি!

ক্লুট্‌সাম্ ঠক্ ঠক্ ক’রে কাঁপতে কাঁপতে সেইদিকে ছুটে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে নেই জনপ্রাণী!

ঘরের বিছানা, চেয়ার ও টেবিল প্রভৃতি উল্টেপাল্টে ছড়িয়ে প’ড়ে রয়েছে এবং রক্তের দাগে চারিদিক হয়ে উঠেছে ভয়ানক! এবং ঘরের ঠিক মাঝখানেই মেঝের উপরে প’ড়ে চক্ চক্ করছে, ইঞ্চিকয়েক লম্বা একটুক্‌রো বরফ!

রাম্‌বোল্ডের সঙ্গে ক্লুট্‌সামের আর কখনো দেখা হয় নি।

কিন্তু সেই রাত্রে হোটেলের সাম্‌নের রাস্তায় যে কন্‌ষ্টেবল্ পাহারা দিচ্ছিল, সে একটা সন্দেহজনক দৃশ্য দেখেছিল।

কালো ওভারকোট-পরা একটা আড়ষ্ট মূর্ত্তি তুষার-বৃষ্টির মধ্য দিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার কাঁধে রয়েছে মস্ত মোটের মতন কি-একটা জিনিষ!

কন্‌ষ্টেবল্ তাকে ধরবার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু খানিক দূর গিয়ে আর তাকে দেখতে পায়নি।

মাণিক বললে, "তাহ'লে ঘটনাটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, মিঃ জেম্‌স্ হাগ্‌বার্ড্‌কে খুন ক'রে মিঃ রাম্‌বোল্ড্ অষ্ট্রেলিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তারপর মিঃ হাগ্‌বার্ডের প্রেতাত্মা প্রতিহিংসা নেবার জন্যে বিলাতে এসে, মিঃ রাম্‌বোল্ড্‌কে হত্যা ক'রে তার দেহ নিয়ে নরকে ফিরে গেল। তুমি কি বলতে চাও, এখানেও মেয়ে চুরি করেছে ভূতেরা?"

জয়ন্ত গাড়ী চালাতে চালাতে গল্প বলছিল। সে মাথা নেড়ে বললে, "পাগল! আমি বললুম গালগল্প,—কেবল খানিকটা সময় কাটাবার জন্যে! তার সঙ্গে এখানকার মেয়ে-চুরির কোনই সম্পর্ক নেই!.........এখন এ-সব কথা থাক্—ঐ দেখ, সামনেই আলিনগরের ভাঙা বাড়ীগুলোর এলোমেলো চূড়ো দেখা যাচ্ছে! এদিকে পথেই পড়েছে নদী। গাড়ী নিয়ে আর এগুবার উপায় নেই, এগুবার দরকারও নেই। গাড়ীখানাকে একটা ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এইবারে আমাদের পদব্রজে এগুতে হবে।"

মোটর থামিয়ে দুজনে নামল। তারপর গাড়ীখানাকে লুকিয়ে এবং চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হ'ল।

কিন্তু পথ যেখানে নদীর ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেইখানে বালির উপরে পাওয়া গেল আবার সেই ছয়-জোড়া পায়ের দাগ!

জয়ন্ত হাঁটু গেড়ে ব'সে খানিকক্ষণ ধ'রে পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করলে। তারপর মুখ তুলে বললে, "মাণিক, এবারের পায়ের দাগে বিশেষত্ব আছে। দাগগুলো বড়-বেশী গভীর হয়ে বালির ভিতরে ব'সে গেছে। যেন এরা সকলে মিলে কোন-একটা ভারি মোট বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছে।"

মাণিক চম্‌কে উঠে বললে, "ভারি মোট! কী হতে পারে সেটা?"

—"হয়তো কোন মানুষের—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের দেহ! নয়তো অন্য-কিছু! সেটা যাই-ই হোক্‌, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের খুব জোর বলতে হবে! এসেই এই দাগগুলো চোখে প'ড়ে গেল! এ সূত্র আর ছাড়ছি না, কারণ এই সূত্র ধ'রেই এবার নিশ্চয়ই সেই ছয় মূর্ত্তিকে আবিষ্কার করব—তারা আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না!"

———

নবম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুপুরে

আলিনগরের কোন বিভীষিকাই তখন সেখানে জেগে নেই। সূর্য্যকরের সোনার ঢেউ আকাশের নীলিমাকে অম্লান ক'রে তুলেছে, পাখীদের গানের তানের ঢেউ বনের শ্যামলিমাকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলেছে, নদীর জলে রূপোলী ঢেউ দুই তটের মাটি, বালি আর পাথরকেও সঙ্গীতময় ক'রে তুলেছে! চারি-দিকে আলো আর গান, শান্তি আর কান্তি!

তারই মধ্যে অন্ধকারের দুঃস্বপ্ন বহন ক'রে আনছে কেবল এই ছয়জোড়া পদচিহ্ন! এই ছয়জোড়া পায়ের অধিকারী, কে তারা? কেন তারা সর্ব্বদাই একসঙ্গে থাকে, কেন তাদের দলের লোক বাড়েও না কমেও না, কেন তারা একতালে পা ফেলে চলে—আর কেন তারা মেয়ের পর মেয়ে চুরি করে? আর, তাদের সঙ্গে নবাবের কোন সম্পর্ক আছে, কিংবা নেই? আর, আলি-নগরে এসে তারা সবাই মিলে কি করে?

জয়ন্ত ও মাণিক এই-সব কথাই ভাবছিল।

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু এই ছয়টা মূর্ত্তি যে প্রেতমূর্ত্তি নয়, এদের দেহ যে ছায়াময় নয়, এরা যে আমাদের মতই রক্তমাংসে গড়া পা দিয়ে মাটি মাড়িয়ে চলে, এখানকার দাগগুলো সে সত্যও প্রকাশ করছে! সেদিনের পায়ের দাগগুলোর ভিতরে যা লক্ষ্য করেছিলুম, আজও তাই লক্ষ্য করছি; এদের মধ্যে একজন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, একটা পায়ের গোড়ালি মাটির উপরে ফেলতে পারে না। এটাও মনুষ্যত্বের আর একটা লক্ষণ—খোঁড়া ভূতের কথা কখনো শুনেছ?"

দুজনে নদীগর্ভের দিকে নামতে লাগল

মাণিক বললে, "দাগগুলো দেখছি নদীর জলের ভিতরে নেমে গেছে। তার মানে, সেই ছ'টা মূর্ত্তি এইখানেই নদী-পার হয়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, তাই আমাদেরও এইখানে নেমেই পার হ'তে হবে! গেল-দুর্য্যোগে নদীর জল বেড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু বোধহয় আমাদের কোমরের বেশী উঠবে না। এই-সব ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর রীতিই এই—এরা যেমন-হঠাৎ বড় হয়ে ওঠে, তেমনি-হঠাৎ ছোট হয়ে পড়ে, এরা যেন প্রকৃতির আবুহোসেন—আজ বড়, কাল ছোট!...... এই আমি দুর্গা ব'লে নেমে পড়লুম,—যা ভেবেছি তাই! জল খুব কম! এস মাণিক, কিন্তু দেখো, বন্দুক রিভলভার আর রসদ যেন জলে ভেজে না!"

নদীর ওপারে উঠে একটুও খুঁজতে হ'ল না, আবার পাওয়া গেল সেই ছয়জোড়া পায়ের দাগ! নদীর বালির বিছানা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেও মাটির উপর দিয়ে চ'লে গিয়েছে পদচিহ্নের সারি।

মাণিক খুসি-গলায় বললে, "জয়, সেদিনকার বিষম বৃষ্টি আমাদের ভারি কষ্ট দিয়েছে বটে, কিন্তু আজ আমরা তাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে পারি! সেই বৃষ্টিতে ভিজে মাটি খুব নরম ছিল ব'লেই পায়ের এমন স্পষ্ট আর স্থায়ী ছাঁচ তুলতে পেরেছে!"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, আর এটাও বোঝা যাচ্ছে, এই ছাঁচগুলো টাট্‌কা, এদের সৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির পরেই। প্রথম শ্রেণীর পথপ্রদর্শকের মত এখন এই পায়ের দাগগুলোই আমাদের নিয়ে যাবে, যাদের খুঁজতে এসেছি তাদের ঠিকানায়! হ্যাঁ, ধন্যবাদ দি বৃষ্টিকে!"

পায়ে-হাঁটা মেটে পথ। কোথাও ঝুপ্‌সী গাছের তলা দিয়ে, কোথাও

কাঁটা ঝোঁপ ও জঙ্গলের তলা দিয়ে, কোথাও ভাঙা-চোরা বাড়ী, ধ্বংসস্তূপ বা ঢিপিঢাপার পাশ দিয়ে অজগরের মত এঁকেবেঁকে, উঠে-নেমে, মোড় ফিরে ফিরে অগ্রসর হয়েছে। পথের উপরে পায়ের দাগগুলো মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়ে গেছে বটে কিন্তু একটু পরেই আবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঘাসজমির আবির্ভাবেও অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তারা জয়ন্ত ও মাণিককে ভয় দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু জমির অন্য প্রান্ত থেকে আবার আত্মপ্রকাশ করছে! পায়ের দাগ তাদের সঙ্গে যেন লুকোচুরি-খেলা খেলছে!

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, পৃথিবীর সব দেশেরই গোয়েন্দাগিরির ইতিহাস পড়লে দেখতে পাবে, পায়ের দাগ, রক্তের দাগ আর আঙুলের ছাপ দেখেই গোয়েন্দারা বেশীর ভাগ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। আঙুলের ছাপ দেখে অপরাধী ধরবার প্রথা একশো বছর আগেও আবিষ্কৃত হয় নি, কিন্তু পায়ের দাগ আর রক্তের দাগ মানুষের কাজে লেগে আসছে হাজার হাজার বছর আগে থেকেই—মানুষ যখন সভ্যও হয় নি। এই দু-রকম দাগের কোন-না-কোনটি দেখে আদিম মানুষ বনে-জঙ্গলে শিকারের খোঁজ পেয়ে জীবনধারণ করেছে—এখনকার সখের শিকারীদেরও কাছে ঐ দু-রকম দাগই হচ্ছে সব-চেয়ে বড় সম্বল। আর পাপীদেরও জব্দ করেছে চিরকাল ঐ দু-রকম দাগই! সব পাপীই এই দু-রকম দাগকে ভয় করে, কিন্তু তবু এদের কবল থেকে নিস্তার পায় না—যেমন আজও পাবেনা আমাদের হাত থেকে মুক্তি, এই ছয়জন মেয়ে-চোর!"

মাণিক বললে, "এরা খালি মেয়ে-চোর নয়, হত্যাকারীও বটে!"

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বললে, "হুঁ। শেষ যে মেয়ে চুরি গেছে, এরা তার মাকে খুন করেছে। কিন্তু মাণিক, এখনো এ-রহস্যটা

আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে, মৃতদেহের গলায় অত-বড় ক্ষতচিহ্ন, কিন্তু তার দেহের রক্ত গেল কোথায় ? এক হ'তে পারে, হত্যাকারী দাঁত দিয়ে তার গলায় ছ্যাঁদা ক'রে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে—আর যেটুকু রক্ত মাটিতে প'ড়েছিল তাও জিভ দিয়ে চেটেপুটে তুলে নিয়েছে, কিন্তু মানুষের পক্ষে এও কি সম্ভব ? এই ছয়জন খুনে মেয়েচোর যে মানুষ, সে-বিষয়ে তো সন্দেহ করবার উপায় নেই !"

হঠাৎ মাণিক উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "দেখ জয়, দেখ !"

মাণিকের দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে জয়ন্ত দেখলে, যে-দুখানা মোটরে চ'ড়ে তারা সেদিন আলিনগরে এসেছিল, তাদেরই ভগ্নাবশেষ ! একখানা প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়ীর স্তূপের উপরে দু-জায়গায় গাড়ী-দুখানা চূরমার হয়ে প'ড়ে আছে !

জয়ন্ত কৌতূহলী চোখে দেখতে দেখতে পায়ে পায়ে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাদের ভিতর থেকে এটা-ওটা-সেটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে ফিরে বললে, "মাণিক, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি ?"

—"কি ?"

—"গাড়ীর ভিতরে আমাদের খাবার ছিল। হয়তো ফল বা পাঁউরুটি প্রভৃতি চারিদিকে ঠিকরে ছড়িয়ে পড়েছিল ব'লে বনের পশু-পক্ষীরা সেগুলোর সদ্ব্যবহার করেছে। কিন্তু গাড়ীর ভিতরে ছিল বন্ধ একটিন বিস্কুট আর তিন টিন 'জাম্' আর চায়ের 'ফ্লাস্ক্'। সেগুলোর একটা ভাঙা টুক্‌রোও এখানে নজরে পড়ছে না ! খাবারের চাঙাড়িরও টুক্‌রো এখানে নেই—তাও কি জন্তুরা খেয়ে ফেলেছে ?"

মাণিক আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "তাইতো দেখছি ! সত্যি, অতি-বড় পেটুক

জন্তুও তো টিন বা ধাতু বা ভাঙা চাঙাড়ি হজম করতে রাজি হবে না! সেগুলো গেল কোথায় তবে?"

—"কোথায় আর? ঐ নবাব, কি ছয় মূর্ত্তির বাসায়! গাড়ীখানাকে ধ্বংসের পথে চালিয়ে দেবার আগে খাবারগুলোকে বাজে নষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা হয়েছে আর কি! মাণিক, যারা স্যাণ্ড্উইচ্ আর কলা খায়, 'জ্যাম্' আর বিস্কুটের টিন খোলে, নিশ্চয়ই তারা ভূত নয়! এই-সব মেয়ে চুরি আর খুনের মূলে আছে তোমার-আমার মত মানুষই!"

মাণিক বললে, "এ প্রমাণটা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম! চল তবে, আবার সেই খুনে মেয়ে-চোর আর খাবার-চোর মানুষদের পদচিহ্ন অনুসরণ করা যাক্!"

তারা জনশূন্য আলিনগরের একপ্রান্ত দিয়ে চলছে। ছোট-বড়-মাঝারি বিবর্ণ, সংস্কার অভাবে জীর্ণ, কঙ্কালসার বা একেবারে ভাঙা বাড়ীর পর বাড়ী যেন নিজেদের দুর্ভাগ্যের ভারে স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে আছে, কিন্তু একদিন তারা অনেক আলোকমালা দেখেছে, অনেক উৎসব-কোলাহল শুনেছে। তাদের ছায়ায় ছায়ায় কত হাসি আর অশ্রুর বিচিত্র অভিনয়ের যবনিকা বারংবার উঠেছে ও পড়েছে, সে হিসাব যেন তারা আজও ভুলে যায় নি। যেখানে আগে শত শত সঙ্গীতের ও শত শত নূপুরের ধ্বনি জেগে উঠত ক্ষণে ক্ষণে, সেখানে আজ স্তব্ধতার মৃত্যু-নিদ্রা ভঙ্গ করছে কেবল দেয়ালে দেয়ালে গজিয়ে-ওঠা অশথ্-বটের শাখায় শাখায় বন্য বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের কান্না। যাদের চাতালে চাতালে আগে জীবন্ত ফুলের মত শিশুরা করত সুমধুর লীলা-খেলা, সেখানে আজ পাথরে পাথরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে কেবল সাপ, বিছা ও গিরগিটির দল!

মাণিক দুঃখিত স্বরে বললে, "জয়, আমার পার্সী কবি ওমর খৈয়ামের কবিতা মনে পড়ছে ঃ

> রাজার বাড়ীর থামের সারি আকাশ-ছোঁয়া তুলত মাথা,
> রতন-মুকুট 'পরে হেথায় সোনার তোরণ ধর্‌ত ছাতা।
> আজ সেখানে আঁধুল মায়ায় বিজন ছায়া দুলিয়ে দিয়ে
> 'ঘু-ঘু-ঘু-ঘু'র আকুল স্বরে গাইচে কপোত অশ্রু-গাথা।"

জয়ন্ত বললে, "এখন মনে হচ্ছে, এই ছয়জন দুরাত্মা বাস করবার ঠিক জায়গায়ই বেছে নিয়েছে! যারা সমাজের আর মানুষের শত্রু, জ্যান্তো সহরের জনতা তাদের ভালোও লাগবে না, সহ্যও হবে না! তাই এসে আস্তানা গেড়েছে তারা এই মরা সহরে! ভাই মাণিক, ঘর-বাড়ীর আত্মা থাকে না জানি, কিন্তু এখানকার বাড়ী-ঘরগুলোকে দেখলে প্রেতাত্মার ছবি দেখছি ব'লেই কি সন্দেহ হয় না?"

মাণিক বললে, "হ্যাঁ, এরা প্রেতাত্মার মতই ভয়ের ভারে প্রাণ-মন অভিভূত ক'রে দেয়!"

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, "এই আমরা সেই গোরস্থানের আর এক-দিকে এসে পড়লুম! এরই মধ্যে সেই ভয়ানক রাতে ছয়টা আলো-কে চলা-ফেরা করতে দেখেছিলুম!"

মাণিক বললে, "পায়ের দাগের রেখা যে এরই মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে!"

—"তা'হলে আমরাও এর মধ্যে ঢুকব! মাণিক, বন্দুক প্রস্তুত রাখো, হয়তো এইটেই সেই সয়তানদের আড্ডা! হয়তো এইবারে তারা আমাদের দেখতে পাবে, আর দেখতে পেলে যে জামাই-আদর করবে না, সে-বিষয়ে একতিল সন্দেহ নেই!"

তারা দুজনেই সেইখানে দাঁড়িয়ে বন্দুকে টোটা ভ'রে নিলে, নিজের নিজের রিভলভার পরীক্ষা করলে।

মাণিক বললে, "কিন্তু অমিয়বাবু আর তাঁর বন্ধুদের মতে, বন্দুকের গুলি বেমালুম হজম ক'রে তারা আক্রমণ করতে পারে!"

জয়ন্ত বললে, "আমি ও-কথা বিশ্বাস করি না। গোলা-খা-ডালার যুগ আর নেই! অমিয়বাবুদের গুলি খেয়েছিল বনের গাছ আর পাহাড়!"

তারা চারিদিকে সাবধানে তাকাতে তাকাতে গোরস্থানের ভিতরে প্রবেশ করলে! আলিনগরের কোথাও জীবনের পরিচয় নেই বটে, কিন্তু এইবারে দেখা দিলে খালি মৃত্যুর চিহ্ন! এখানকার প্রত্যেক উঁচু ঢিপিটাও এক-একটি বিয়োগান্ত জীবন-নাট্যের শেষ-নিদর্শন—মানুষের অশান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার তুচ্ছ পরিণাম! চঞ্চল আলো-ছায়ার জীবন্ত লীলা বুকের উপরে নিয়ে নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে আছে কবরের পর কবরের সার। তাদের তলায় চির-নিদ্রার স্বপ্নহীনতার মধ্যে শুয়ে আছে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিতাড়িত কত মানুষের কঙ্কালের পর কঙ্কাল এবং তাদের উপর দলে দলে ফুটে আছে কত আগাছার কত রঙের ফুলের পর ফুল! মানুষের স্মৃতি যাদের ভুলেছে, প্রকৃতির প্রেম তাদের মনে ক'রে রেখেছে!

দু-ধারের কবরের মাঝখান দিয়ে চ'লে পদচিহ্নরেখা গোরস্থানের আর-একপ্রান্তে যেখানে গিয়ে শেষ হ'ল, সেইখানে মস্ত ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে একখানা প্রকাণ্ড অট্টালিকা।

জয়ন্ত ও মাণিক তার দিকে তাকিয়ে দেখলে, এই অট্টালিকাও বহুকালের পুরাণো বটে, কিন্তু আলিনগরের অন্যান্য বাড়ীর মত এখানা ততটা জীর্ণ ও ভাঙাচোরা নয়! এর অনেকগুলো দরজার কবাট ও জান্‌লার পাল্লা এখনো

অটুট আছে এবং এক সময়ে এখানা যে খুব বড় ধনীর বা রাজা-উজীরের প্রাসাদ ছিল, তাও অনুমান করা যায়!

অট্টালিকার প্রবেশ-পথটিও প্রকাণ্ড। হয়তো আগে এখানে জাঁকালো সাজ-পরা সেপাই-শাস্ত্রীরা বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পাহারা দিত, হয়তো আজ তাদেরও কঙ্কাল নিসাড় হয়ে আছে ঐ গোরস্থানেরই কোন বুঁজে-যাওয়া গর্ত্তে! কিন্তু আজ এই দেউড়ী হয়েছে শেয়াল-কুকুরের আনাগোনার রাস্তা!

কিন্তু দেউড়ীর সামনেই কী ওটা প'ড়ে প'ড়ে পৈতার মত সরু সরু ধোঁয়া ছাড়ছে?

ধোঁয়া! জনহীনতার রাজ্যে ধোঁয়া? ধোঁয়ার সৃষ্টিকর্ত্তা হচ্ছে অগ্নি! এবং অধিকাংশ অগ্নির সৃষ্টিকর্ত্তা হচ্ছে মানুষ! মাণিক আশ্চর্য্য হয়ে এগিয়ে গেল এবং তাড়াতাড়ি একটা জিনিষ তুলে জয়ন্তের চোখের সামনে ধরলে!

জয়ন্ত সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, একটা আধ-পোড়া 'কাঁচি' সিগারেট, তখনো তার আগুন নেবে নি।

দুজনেই বুঝলে, শত্রু একটু আগেই এখান দিয়ে চ'লে গিয়েছে এবং খুব কাছেই কোথাও আছে—হয়তো আড়ালে গা ঢেকে তাদেরই গতিবিধি লক্ষ্য করছে!

দুই বন্ধুর সন্দিগ্ধ ও সতর্ক চক্ষু চতুর্দ্দিকে ঘুরতে লাগল—কিন্তু কোথাও কারুর দেখা বা সাড়া পাওয়া গেল না!

মাণিক চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "এখন কি করবে?"

জয়ন্ত তেমনি স্বরে বললে, "বাড়ীর ভিতরে ঢুকব!"

—"শত্রু আছে জেনেও?"

—"আমরা তো এখানে বন্ধুদের সঙ্গে খোসগল্প করতে আসিনি! যত শীঘ্র শত্রুর দেখা পাওয়া যায় ততই ভালো।"

—"তা বটে!"

বন্দুকদুটো তারা পিঠের উপরে বাঁধলে। তারপর 'বেল্ট' থেকে রিভলভার খুলে হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলে।

একটা বুক-চাপা ভয়াবহ নীরবতায় সেই বিশাল অট্টালিকার ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। খানিকদূর এগিয়ে পাওয়া গেল প্রকাণ্ড এক উঠান —তার ভিতরে বোধহয় দুইহাজার লোকের স্থান সংকুলান হয়। উঠানের চারিদিকে সারি সারি থাম ও দরদালান এবং দালানের পরেই চক-মিলানো ঘর। উঠানের সর্ব্বত্রই বড় বড় ঘাস ও আগাছার ঝোপ। কোথাও জীবনের এতটুকু লক্ষণ নেই—কেবল গাম্ভীর্য্য গম-গম করছে, সে যেন মৃত্যুপুরীর গাম্ভীর্য্য! দেউড়ীতে এইমাত্র সেই জ্বলন্ত সিগারেটটা না দেখলে জয়ন্ত ও মাণিক কিছুতেই সন্দেহ করতে পারত না যে, এই নিদ্রিত অট্টালিকার ত্রিসীমানায় বহুবৎসরের মধ্যে কোন জ্যান্তো মানুষের ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে! এখানকার নির্জ্জনতা যেন ভৌতিক,—বুকের রক্ত জ'মে যায়, গা ছম্ ছম্ করে, পা এলিয়ে পড়ে! অসহনীয়!

মাণিক ফিস্-ফিস্ ক'রে বললে, "এই বিশালতার মধ্যে আমরাই যে হারিয়ে গেছি ব'লে মনে হচ্ছে! এর মধ্যে কোন্‌দিকে কাকে আমরা খুঁজব?" —তার সেই অতি-মৃদু গলার আওয়াজও সেই নিসাড় পুরীর মাঝখানে উচ্চকণ্ঠের গর্জ্জনের মত শোনালো!

জয়ন্ত আরো খাটো-গলায় মাণিকের কাণে কাণে বললে, "কিন্তু খুঁজতে

হয়েই! এস, আগে একতালার সব ঘরেই একবার ক'রে উঁকি মেরে আসি,—তারপর দোতালা, তারপর তেতালা।"

তারা একে একে প্রত্যেক ঘরে খুব সন্তর্পণে ঢুকে পরিদর্শন আরম্ভ করলে। ঘরে ঘরে বাস করছে যুগ-যুগান্তরের ধূলা ও সন্ধ্যার আলো-আঁধারি! একটা ঘরের কোন্ কোণ থেকে সাপ ফোঁস ক'রে উঠল! প্রত্যেক ঘরের দরজাই খোলা।

মাণিক বললে, "এই পোড়ো বাড়ীর একতালা ঘরে মানুষ থাকতে পারে না, মানুষের মন এখানে কুঁকড়ে পড়ে!"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু আমরা খুঁজছি সেই-সব অমানুষিক মানুষকে, পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যাদের ভূতের চেয়ে কম ভয় করে না। ভালো-মানুষের প্রাণ যারা মাটির খেলনার মত ভেঙে ফেলতে পারে, এমন জায়গায় এলে তারা হয়ে ওঠে খুব-বেশী-খুসি!"

ডানদিকের দীর্ঘ দালানের শেষ ঘরটায় দরজার বাহির থেকে শিকল তোলা ছিল। শিকল নামিয়ে মাণিক প্রথমেই ঘরের ভিতরে ঢুকল, এবং তার পর-মুহূর্ত্তেই চম্‌কে বাইরে বেরিয়ে এল,—তার মুখ একেবারে সাদা!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে মাথাটা একবার গলিয়ে দিলে!

ধূলিধূসরিত মেঝের উপরে পাশাপাশি শুয়ে আছে ছয়টা মানুষের মূর্ত্তি!

দশম পরিচ্ছেদ

জীবনহারা জীবন্তের দল

যে-ছয়টা বিভীষণ মূর্ত্তির জন্যে চতুর্দ্দিকে এমন হুলুস্থূলু বেধে গিয়েছে, এই আধা-আলোয় ও আধা-অন্ধকারে তারাই শুয়ে আছে পাশাপাশি!

কিন্তু ওরা জেগে, কি ঘুমিয়ে? ওরা তাদের সাড়া পেয়েছে, কি পায়নি? আর, অমন আদুড় মাটিতে, ধূলো-জঞ্জালেই বা ওরা শুয়ে আছে কেন? ওরা মট্‌কা মেরে প'ড়ে নেই তো?

অসম্ভব নয়। এই ছয়টা মূর্ত্তির প্রকৃতি যে হিংস্র, প্রথম দিনেই আলিনগরে এসে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই ছয় চোরে-চোরে-মাস্‌তুতো ভাই যে কত বেশী চালাক, প্রান্তর-সমুদ্রে তারও পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এদের কাছে জয়ন্তদের দুই-দুইবার পরাজিত হ'তে—এমন কি প্রায় গালে চুণ-কালি মাখ্‌তে, হয়েছে! তারাই এত সহজে এত অসহায় ভাবে ধরা দিতে রাজি হবে? এদের এই চুপ-ক'রে শুয়ে থাকা অত্যন্ত সন্দেহজনক!

জয়ন্ত ও মাণিক বাইরে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই-সব ভাবতে লাগল।····· এক দুই ক'রে ছয়-সাত মিনিট কেটে গেল, এই অসম্ভব নিস্তব্ধতার মুল্লুকে মূর্ত্তিদের কেউ পাশ ফিরলেও তারা সেটা টের পেত, কিন্তু ঘরের ভিতরে কোন সাড়া নেই—একটা নিঃশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত না! যদি তাদের জন্যে কোনরকম ফাঁদ পাতা হয়ে থাকে, তবে এ কি-রকম

ফাঁদ ? ওরা ছয়জন, তারা দুইজন মাত্র, তবু ওরা আক্রমণ করবার জন্যে একটু উস্‌খুস্‌ পর্য্যন্ত করছে না কেন ?

জয়ন্ত রিভলভারটা ধ'রে দরজার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে একটুখানি মুখ বাড়িয়ে আবার তাদের চট্‌ ক'রে দেখে নিলে।

তারা ঠিক তেমনি ভাবেই পাশাপাশি শুয়ে আছে। তবে কি সত্যিই তারা ঘুমুচ্ছে ? কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কই ? দুষ্টুমি ক'রে তারা কি দম বন্ধ ক'রে আছে ? কিন্তু দম বন্ধ ক'রে মানুষ আর কতক্ষণ থাকতে পারে ?

আরো মিনিট-পাঁচেক পরেও তারা তেমনি ভাবেই রইল দেখে জয়ন্ত নিজের মুখখানা ভিতরে আরো-খানিকটা বাড়িয়ে দিলে। তখনো মূর্ত্তিগুলোর সেই ভাব ! শেষটা যা থাকে কপালে ভেবে সে একেবারে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং মাণিকও সাহস সঞ্চয় ক'রে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল—

এবং প্রথমেই যা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হচ্ছে এই ঃ

একটা মূর্ত্তি ড্যাব্‌-ড্যাব্‌ ক'রে তাদের পানে নিষ্পলক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে !

জয়ন্তের হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল ! মাণিক রিভলভারের ঘোড়া টিপে দেয় আর কি,—কিন্তু জয়ন্ত তার হাত চেপে ধ'রে মৃদুস্বরে বললে, "অন্য মূর্ত্তিগুলোর চোখ দেখ !"

কোন মূর্ত্তির চোখ আধ-খোলা, কোন মূর্ত্তির চোখ একেবারে মোদা !··· যে-মূর্ত্তিটা পূরো চেয়ে আছে, তারও চোখে কোন ভাব নেই !

—"জয় ! জয় !"

—"মাণিক, এগুলো মড়া !"

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে একে একে মূর্ত্তিগুলোর বুকে হাত দিয়ে দেখলে। শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন লক্ষণ নেই। গা কাঁচের মত ঠাণ্ডা!

—"কিন্তু মাণিক, কি ক'রে এরা মরল? কে এদের মারলে?"

—"জয়, ডানদিকের ঐ মূর্ত্তিটার কপালের উপরে তাকিয়ে দেখ!"

জয়ন্ত হেঁট হয়ে দেখে বললে, "হুঁ, বুলেটের দাগ! এখনো শুকোয় নি, দাগটাও নতুন নয়।"

—"তবে কি অমিয়বাবুদের বুলেটের এই কীর্ত্তি?"

—"হ'তে পারে। কিন্তু কপালে অমন ভাবেও গুলি খেয়ে কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে?······আরে, আরে, এই যে! এ মূর্ত্তিটারও পেটে একটা ছ্যাঁদা—ওখানেও বুলেট ঢুকেছে! আর, এটারও পায়ে লেগেছে বন্দুকের গুলি! হুঁ, এই মূর্ত্তিটাই তাহ'লে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত,—পায়ের দাগ দেখেই আমি যা ধরতে পেরেছিলুম! কিন্তু বাছারা, কে তোমরা? বন্দুকের বুলেট খেয়েও তোমরা মরো না,—বড়-জোর খুঁড়িয়ে হাঁটো, কিন্তু আজ তোমরা পটল তুলেছ কেন?"

—"দেখ জয়, যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে, ঐ সব বুলেটই ঐ তিনটে লোকের মৃত্যুর কারণ, তাহ'লে বাকি তিনটে লোক মরল কেন? ওদের গায়ে তো দেখছি একটা আঁচড় পর্য্যন্ত নেই! কিসে ওরা মরেছে? বিষে? কেউ বিষ দিয়েছে, না ওরা একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছে?"

—"মাণিক, এদের কারুর দেহেই বিষের কোন লক্ষণই নেই! এদের কেউ কোন উপায়েই হত্যা করেছে ব'লেও মনে হচ্ছে না! এরা এসে যেন পাশাপাশি শুয়ে প'ড়ে পরম নিশ্চিন্ত আর শান্ত ভাবে মৃত্যুঘুমে ঢ'লে পড়েছে! অথচ এরা যে পর্শু রাত পর্য্যন্ত বেঁচে ছিল সে প্রমাণও রয়েছে—

অবশ্য যদি মানা যায় যে পর্শু রাতে এরাই মেয়ে চুরি আর খুন ক'রেছিল! এমন বিচিত্র ব্যাপার আমি কখনো কল্পনা করিনি—এমন আশ্চর্য্য মৃত্যুও কখনো দেখিনি! মাণিক, স্বীকার করতে লজ্জা নেই—মনের মাঝে আমি ভয়ের সাড়া পাচ্ছি! ভবতোষ মজুমদারের বজরায় আমরা জ্যান্তো মড়া দেখেছিলুম, * কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার, তার মধ্যে ছিল বৈজ্ঞানিক সত্য, কিন্তু এ কী কাণ্ড! বুলেট খেয়ে এরা মরে না, অথচ আজ অকারণেই এখানে এসে ম'রে প'ড়ে রয়েছে। মানুষের রক্ত-মাংস বুলেট্‌কে অগ্রাহ্য করে, এটাই বা কী অস্বাভাবিক কথা!"

মাণিক মূর্ত্তিগুলোর উপরে আর একবার শিউরে-ওঠা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "জয়, ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখ, এ মড়াগুলো কি অনেক দিনের পুরাণো পচা মড়া ব'লে মনে হয় না? এই ঘরের ভিতরে কি একটা কবরের ভাব আড়ষ্ট হয়ে নেই? এখানকার বাতাসেও যেন পচা মড়ার দুর্গন্ধ! আমার দেহ কেমন-কেমন করছে, আমার বমন করবার ইচ্ছা হচ্ছে,—চল জয়, এই কবরের বিভীষিকার ভিতর থেকে পালিয়ে যাই!"

আচম্বিতে দরজার কাছটা অন্ধকার হয়ে গেল!

জয়ন্ত ও মাণিক চম্‌কে ফিরে দাঁড়াল এবং ঘরের ভিতরে এক পা বাড়িয়ে আবির্ভূত হ'ল নবাবের সুদীর্ঘ মূর্ত্তি—কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই আবার সে অদৃশ্য হয়ে গেল!

—"মাণিক—মাণিক!—এস আমার সঙ্গে"—বলতে বলতে জয়ন্ত ঘর থেকে তেড়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মত!

তারা বাইরে বেরিয়ে দেখলে, নবাব তখন দালানের উপর দিয়ে ছুটছে!

---

* মৎপ্রণীত "জয়ন্তের কীর্ত্তি" দেখুন।

—"মাণিক, ওকে কিছুতেই আর পালাতে দেওয়া হবে না, প্রাণ যায় তাও স্বীকার—তবু ওকে ধরতেই হবে !"

নবাব হঠাৎ বামদিকে ফিরে আবার অদৃশ্য হ'ল ! জয়ন্ত সেখানে গিয়েই পেলে প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি—দুম্‌দাম্‌ পায়ের শব্দে বুঝলে নবাব সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে ! তারাও এক এক লাফ মেরে দুই-তিনটে ক'রে ধাপ্‌ পেরিয়ে উপরে উঠতে লাগল !

—একেবারে দোতালার দালানে। নবাব আবার এক জায়গায় গিয়ে অদৃশ্য হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে দুম্‌-দুম্‌ ক'রে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ !

সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে মাণিক বললে, "এখন উপায় ?"

—"উপায় ? মিছেই কি আমি ব্যায়াম করি—ছয়-সাত মণ ওজনের মাল তুলে ছুঁড়ে ফেলে দি ?"

মাণিক দরজার উপরে সজোরে পদাঘাত করলে—দরজা একটু কাঁপলও না ! হতাশ ভাবে বললে, "এ দরজা ভাঙতে গেলে হাতী আনতে হবে !"

—"কিছুই আনতে হবে না, আমার মাংসপেশীর জয় হোক্‌"—ব'লেই জয়ন্ত দরজার উপরে পিঠ রেখে দেহের সমস্ত মাংসপেশী ফুলিয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে একবার, দুবার, তিনবার !

দড়াম্‌ ক'রে খুলে গেল দরজা—সঙ্গে সঙ্গে টাল্‌ সামলাতে না পেরে জয়ন্ত ঘরের ভিতরে প'ড়ে গেল !

মাণিক একলাফে জয়ন্তের দেহ টপ্‌কে ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলে, নবাব একটা গরাদে-ভাঙা জানলা দিয়ে গ'লে বাইরে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে।

মাটির উপরে লম্বমান অবস্থাতেই জয়ন্ত মাথা তুলে চেঁচিয়ে বললে, "দেহের নীচের দিকে গুলি কর মাণিক! লাফ মারলে আর ওকে পাব না!"

জয়ন্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই মাণিকের রিভলভার গর্জ্জন ক'রে উঠল! বিকট আর্ত্তনাদ ক'রে নবাব জান্‌লা ছেড়ে ঘরের ভিতরে ব'সে পড়ল!

জয়ন্ত ততক্ষণে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সে ও মাণিক এগিয়ে গিয়ে নবাবের দুই পাশে স্থানগ্রহণ করলে।

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, এর মাথা টিপ্‌ ক'রে রিভলভার ধ'রে থাকো! আমি এর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দি! এ একটু বাধা দিলেই রিভলভার ছুঁড়বে!"—জয়ন্ত হাতকড়া বার করলে, নবাব ভালোমানুষের মত হাত বাড়িয়ে দিলে!

মাণিকের রিভলভারের গুলি লেগেছিল নবাবের উরুর পাশে। সেখান থেকে দর্‌-দর্‌ ধারে রক্ত ঝরছে!

তার ক্ষতটা পরীক্ষা ক'রে জয়ন্ত বললে, "না, ভয় নেই! এ মরবে না।······তারপর নবাব, এইবারে তোমার নবাবীর খবর বল!"

তখন দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে—ঘরের ভিতরে একটু-একটু ক'রে আসন্ন রাত্রির আভাস জেগে উঠছে। বাহির থেকে গাছের পাতারা তাদের মর্ম্মর-বার্ত্তা প্রেরণ করছে, তা ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই।

—"কি হ'ল নবাব, তুমি চুপ ক'রে রইলে কেন?"

নবাবের সেই সাপের মত নির্দ্দয় চক্ষে এতক্ষণ পরে আবার আগুন ফিরে

এল। সে একবার মুখ তুলে জান্‌লা দিয়ে বাইরের রৌদ্রহীন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তারপর জয়ন্ত ও মাণিকের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে সহজ ও শান্ত স্বরেই বললে, "তোমরা কি জানতে চাও?"

—"তুমি মেয়েদের চুরি ক'রে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?"

—"জানি না।"

—"জানো না?"

—"না।"

—"এখানে তুমি কি কর?"

—"জানি না।"

—"তোমার ঐ ছয় স্যাঙাত মরল কেন?"

—"জানি না।"

—"অর্থাৎ তুমি কিছুই বলবে না?"

—"না।"

—"আমি এখনি দেশলাইয়ের কাঠি জেলে তোমার চিবুকের তলায় ধরব—ধীরে ধীরে তোমার দেহের মাংস পোড়াব।"

—"পোড়াও। তবু কিছু বলব না।"

—"আচ্ছা, আগে তো তোমায় নিয়ে গিয়ে ফাটকে আটক করি, তারপর তোমার মুখ খোল্‌বার ভালো ব্যবস্থাই করব।"

—"একবার তো সে চেষ্টা ক'রেছিলে। পেরেছিলে কি?"

—"ওঃ, ভাবছ আবার তুমি পালাবে? বেশ, দেখা যাবে। এখন তো আমার সঙ্গে চল!"

—"আমি এখান থেকে যাব না।"

—"যাবে না? তোমার ঘাড় যাবে! আমরা তোমাকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাব।"

নবাবের দুই চক্ষু দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। জয়ন্তের দিকে চেয়ে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে সে বললে, "তুমি আমাকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাবে? লাথি মারতে মারতে? পারবে না!"

—"দেখবে, পারি কি না?"

নবাব আর জবাব দিলে না। হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে ব'সেছিল। সেই অবস্থায় তার দেহ হঠাৎ সোজা হয়ে উঠল, তার অগ্নিবর্ষী চক্ষুদুটো মুদিত হয়ে গেল,—তাকে দেখলেই মনে হয়, ধ্যানমগ্ন নিষ্কম্প এক প্রতিমূর্ত্তি!

মাণিক হেসে ফেলে বললে, "এ আবার কি নতুন ঢং!"

জয়ন্ত বললে, "জানোই তো. প্রবাদে আছে—'দুরাত্মার ছলের অভাব নেই!' নবাব-বাহাদুরের কালো আল্‌খাল্লার তলায় কত কলাকৌশল লুকানো আছে, কে তা জানে? বিড়াল আহ্নিকে ব'সেছেন বোধ হয় আমাদের প্রশ্ন এড়াবার জন্যে?"

কিন্তু সে-সব কথা যে তার কাণে ঢুকল, নবাব তেমন কোনই ভাব প্রকাশ করলে না। তার সমস্ত বাহ্যজ্ঞান তখন যেন লুপ্ত হয়ে গেছে—কেবল থেকে থেকে তার কপালের উপরে শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে! ওদিকে তার আহত উরু দিয়ে রক্ত ঝ'রে যে কাপড় ও ঘরের মেঝের ধূলো ভিজিয়ে আরক্ত ক'রে তুলছে, নবাবের সে খেয়াল পর্য্যন্ত নেই! যন্ত্রণাও তার হচ্ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তার মুখে যন্ত্রণার কোন চিহ্নই ফুটে ওঠে নি।

মাণিক জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। একবার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে। জান্‌লার ঠিক তলাতেই রয়েছে বালির স্তূপ। সেইদিকে জয়ন্তের

"একটা আধ-পোড়া 'কাঁচি' সিগারেট"—৯২ পৃষ্ঠা

দৃষ্টি আকৃষ্ট ক'রে বললে, "জয়, নবাবটা কি-রকম ধড়ীবাজ দেখ! এখান থেকে বা তিনতালা থেকেও ঐ বালির স্তূপের উপরে লাফিয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙ্‌বার কোন ভয়ই নেই। বিপদের সময়ে পালাবার ব্যবস্থা আগে থাকতেই ক'রে রাখা হয়েছে! কিন্তু তবু সে পালাতে পারলে না, তোমার দেহের অদ্ভুত শক্তির জন্যে!"

—"আর তোমার রিভলভারের জন্যে!"

—"কিন্তু আর কতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবাবের ভণ্ডামি দেখব? আধ-ঘণ্টার মধ্যেই রাতের অন্ধকারে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে, নবাবকে এইবারে জাগাও।"

কিন্তু তাকে আর জাগাতে হ'ল না, সে নিজেই আবার চোখ খুলে বললে, "তোমরা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাও? পারবে না!"

জয়ন্ত হো হো ক'রে হেসে বললে, "ওহো হো, তুমি বুঝি ধ্যানদৃষ্টিতে নিজের ভবিষ্যৎ দেখে নিয়ে বুঝে ফেললে যে, তোমাকে এখান থেকে সরাবার শক্তি আমার হবে না?"

নবাবও দ্বিগুণ জোরে হা-হা-হা-হা অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "তোমরা পারবে না—পারবে না—পারবে না! আমাকে এ ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না! জানো, তোমরা কার সঙ্গে লাগতে এসেছ? আমাকে গুলি মেরে জখমই কর, আর আমার হাতে হাতকড়িই পরিয়ে দাও, তবু আমি হব তোমাদের প্রভু! পৃথিবীর কোন সম্রাটের যে-শক্তি নেই, আমার বুকে আছে সেই বিপুল শক্তি! মানব-দানব ভূত-প্রেত—আমার আজ্ঞাপালন করবে সবাই! আমি এই মৃত আলিনগরের একচ্ছত্র সম্রাট, এখানে আমার উপরে আর কারুর আজ্ঞা চলবে না, তোমাদেরও জীবন-মরণ এখন আমারই

হাতে! তোমরা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না, পারবে না, পারবে না! হা হা হা হা হা হা হা—" তার ভীষণ ও অলৌকিক অট্টহাস্য সেই সুবিশাল মৃত্যু-প্রাসাদের মহাস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ ক'রে প্রত্যেক খিলানে খিলানে গিয়ে যেন আছ্‌ড়ে প'ড়ে ছুটাছুটি করতে লাগল,—ঘরের ছাদের তলা থেকে সয়তানের অভিশাপের মতন কালো একঝাঁক বাদুড় ভয় পেয়ে অন্ধকার-দিয়ে-বোনা ডানা ঝট্‌পট্‌ ক'রে জান্‌লা দিয়ে গ'লে বাইরে উড়ে গেল, কোথায় শুয়ে শুয়ে জুতোর কালির চেয়ে কালো একটা বিড়াল বোধহয় ঘুমোচ্ছিল, অট্টহাসির ঘটায় জেগে উঠে দরজার কাছে এসে আগুনচোখে একবার ভিতরে উঁকি মেরে ও তীক্ষ্ণ স্বরে একবার 'ম্যাও' ব'লে প্রতিবাদ জানিয়েই আবার ছুটে পালালো!

হঠাৎ তার মূর্ত্তির এত পরিবর্ত্তন হয়েছে যে, নবাবের দিকে তাকালেও এখন বুক ধুক্‌পুক্‌ ক'রে ওঠে! আচম্বিতে তার এই ভাবান্তরের, এই আস্ফালনের কারণ কি? জয়ন্ত মনের ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল; কিন্তু তখনি জোর ক'রে সেই ভাবটা দমন ক'রে সে ধমকে ব'লে উঠল, "নবাব, তোমার ও বিদ্‌কুটে হাসি থামাও!"

নবাব তার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না ক'রে গম্ভীর কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে, "ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় জীবনহারা জীবন্তের দল! সূর্য্যের চোখ কাণা হয়েছে, দিনের চিলু নিবে গেছে, বাদুড়ের ঘুম ভেঙেছে, কালো বিড়াল জেগেছে, কবরের দরজা খুলেছে,—এইবারে তোরাও উঠে দাঁড়া, গোরস্থানে আলো জ্বাল্‌, নরকের ফটকে সন্ধ্যাবাতি দে! ঝ'রে পড়ুক তোদের গায়ের ধূলো, জাগুক তোদের বুকে বুকে রক্ততৃষা, দুলুক তোদের গলায় গলায় নরমুণ্ডমালা! রাত তোদের ডাক্‌ছে, শ্মশান তোদের ডাক্‌ছে,

আমি তোদের ডাক্‌ছি! ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়রে আয় প্রাণহারা হাপ্রাণীর দল!"

জয়ন্ত সক্রোধে মাটির উপরে পদাঘাত ক'রে বললে, "মাণিক, মাণিক! আমরা কি এখানে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে পাগলের প্রলাপ শুনব? ঐ বদমাইসটার ঝাঁক্‌ড়া-চুল ধরে মাটি থেকে টেনে তোলো তো! দেখি, ও আমাদের সঙ্গে যায় কিনা?"

কিন্তু জয়ন্তের কথা মাণিকের কাণে ঢুকল না, সে তখন কাণ পেতে আর একটা শব্দ শুনছিল। একতালায় সমতালে পা ফেলে কারা চলছে! ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌!

মাণিক সভয়ে জয়ন্তের মুখের পানে তাকালে!

ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌! যেন শিক্ষিত সৈন্যদলের পদশব্দ! ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌! যেন কাদের পরলোক থেকে ইহলোকে আনাগোনার শব্দ! জয়ন্তেরও মুখ সাদা হয়ে গেল! তালে তালে সেই পদশব্দ সিঁড়ির ধাপ্‌ দিয়ে উপরে উঠছে!

নবাব আবার ডাক দিলে—"ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় সজীব মৃত্যুর দল! আয়, আয়, আয়, আয়!"

ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌ ধুপ্‌-ধুপ্‌! শব্দ ক্রমেই নিকটস্থ হচ্ছে!

মাণিক ছুটে দরজার কাছে গেল। মুখ বাড়িয়ে দেখলে, সিঁড়ি পার হয়ে প্রথমে যে-মূর্ত্তিটা আবির্ভূত হ'ল, তার কপালে সেই বুলেটের দাগ! তার পিছনেই দেখা দিলে আর এক মূর্ত্তি!

যেটুকু দেখলে তাই-ই যথেষ্ট! খানিক আগে একতালার কোণের ঘরে সেই তাপহীন, শ্বাসহীন, প্রাণহীন, আড়ষ্ট দেহগুলোর মধ্যেই মাণিক এদের

"নবাব বাইরে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে"

:খে এসেছে! দ্বিতীয় মূর্ত্তির পিছনে যখন আবার একটা মূর্ত্তি খোঁড়াতে াঁড়াতে দালানের উপরে এসে উঠল, মাণিক বেগে সেই ভাঙা জান্‌লার াছে দৌড়ে এসে বললে, "জয়, জয়! বাইরে লাফিয়ে পড়! সেই মড়া-:লো জ্যান্তো হয়েছে!"

নবাব হাঁকলে—"ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় কবরবাসীর !"

ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্!—দরদালান দিয়ে বাঁধা-তালে া ফেলে ফেলে তারা এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে, আর এগিয়ে াসছে। তাড়াতাড়ি আস্‌বার জন্যেও তারা কেউ যেন বেতালে পা ফেলবে া,—কিন্তু প্রতিপদক্ষেপেই সেই মৃত্যুচরের দল কাছে—আরো কাছে এগিয়ে াসছে!

জয়ন্ত রুখে দাঁড়িয়ে বললে, "আসুক ওরা! আমি ওদের ভয় করি না!"

মাণিক তাড়াতাড়ি জয়ন্তের হাত ধ'রে জান্‌লার দিকে তাকে ঠেলে দিয়ে লেলে, "জয়, দুঃসাহসেরও সীমা আছে! মনে রেখো, বন্দুকের বুলেটও :দের গতিরোধ করতে পারে না! ঐ ওরা এসে পড়ল! শীগ্‌গির াফ মারো।"

নবাব এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল—মুখে তার নিষ্ঠুর হাসি! কিন্তু মাণিক :ৎক্ষণাৎ তার এক পা লক্ষ্য ক'রে আবার রিভলবার ছুঁড়লে, বিকৃতমুখে বাব তীব্র চীৎকার ক'রে আবার ভূতলশায়ী হ'ল!

প্রথমে জয়ন্ত, তারপরে মাণিক জান্‌লা গ'লে নীচেকার বালির স্তূপের পরে লাফিয়ে পড়ল। তখনো একেবারে অন্ধকার হয় নি। শেষ-আলোর শিখারা তখনো আকাশে আঁধারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

জয়ন্ত ও মাণিক কোনদিকে না তাকিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে নদীর পথে ছুটল।

ছুটতে ছুটতে মাণিক একবার পিছনে ফিরে দেখলে, দোতালার ভাঙা জান্‌লায় মুখ বাড়িয়ে আছে কতগুলো রক্তশূন্য সাদা মূর্ত্তি!

সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল—"জয়! আরো জোরে—আরো জোরে ছোটো!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

মানুষে অমানুষে যুদ্ধের আয়োজন

এদিকে ফাঁড়ির সবাই ভেবেই অস্থির !

সকাল-বেলায় ঘুম থেকে উঠে সকলে যখন জয়ন্ত ও মাণিকের দেখা পেলে না তখন মনে করলে, তারা কোথাও বেড়াতে গিয়েছে, যথাসময়েই ফিরবে !

কিন্তু যথাসময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল,—কোথায় জয়ন্ত, আর কোথায় মাণিক !

সুন্দরবাবু মতপ্রকাশ করলেন, "ও দুই ছোক্‌রাই অত্যন্ত বারফট্‌কা ! হুম, এত যে সাত-ঘাটের জল খেয়ে মলি', তবু কি বেড়াবার সখ মিট্‌ল না ? আরে, এ পোড়া দেশে দেখবার আছে কি ?"

একটু বেশী বেলা ক'রেই সেদিন দুপুরের খাওয়া শেষ করা হ'ল। তবু তাদের দেখা নেই।

বৈকালী চা-পানের সময় এল।

অমিয় একবার জয়ন্ত ও মাণিকের মোটমাট্‌ নাড়াচাড়া ক'রে বললে, "জয়ন্তবাবু আর মাণিকবাবু অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই বেরিয়েছেন দেখছি। তাঁদের রসদের ব্যাগদুটোও নেই। তবে কি তাঁরা আলিনগরেই গিয়েছেন ?"

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ, বল কি ? সেই যমালয়, যেখানে যমদূতেরা হানা দিয়ে ফিরছে, সেইখানে তারা দুটো প্রাণী গিয়ে কি করতে পারবে ?"

পরেশ ও নিশীথ বললে, "অমিয় বোধহয় ঠিক আন্দাজ করেছে। নইলে এতক্ষণে তাঁরা ফিরে আসতেন।"

সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "তাদের ফেরবার আশা ছেড়ে দাও। আর তারা ফিরছে না।"—এই ব'লে তিনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, কারুর সঙ্গে আর একটা কথাও কইলেন না।

সন্ধ্যা এল। রাত হ'ল। সকলেরই মন খারাপ। মহম্মদ, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ টেবিলের ধারে ব'সে চুপি চুপি পরামর্শ করছেন। সুন্দরবাবু মুড়ি দিয়ে সেই ভাবেই প'ড়ে আছেন।

রাত্রের খাবার সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। অমিয় ডেকে বললে, "উঠুন সুন্দরবাবু, খাবেন আসুন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। আমি খাব না। জয়ন্ত আর মাণিক বেঁচে নেই। আমার মন কেমন করছে। আমার গলা দিয়ে খাবার গলবে না।" তাঁর গলা ধরা-ধরা। বোধহয় মুড়ি দিয়ে তিনি কাঁদছেন।

মহম্মদ বললেন, "আপনি না পুলিসে কাজ করেন? এত সহজে কাবু হয়ে পড়লেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "পুলিসে কাজ করি ব'লে কি আমি মানুষ নই? আমার প্রাণ পাথর? আমি খাব না।"

মহম্মদ বললেন, "শুনুন সুন্দরবাবু। পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল যে, কাল সকালেই আমরা সদল-বলে আলিনগরে যাত্রা করব। সদর থেকে হুকুমও এসেছে। দুদিন পরেই যেতুম, কিন্তু যে-রকম ব্যাপার দেখছি, আর দেরি করা চলে না।"

সুন্দরবাবু উঠে ব'সে বললেন, "ঠিক বলছেন তো?"

—"হ্যাঁ।"

—"কিন্তু জয়ন্ত আর মাণিককে কি পাওয়া যাবে? আলিনগর যে ভূতের রাজা।"

—"সুন্দরবাবু, ভুত-টুৎ সব বাজে কথা! কোন বদমাইস ভূতের ভয় দেখায়। জয়ন্তবাবু বোকা নন—আত্মরক্ষা করতে জানেন।"

—"হুম্। সে বোকা নয় বটে, কিন্তু গোঁয়ার। তাই তার জন্যে ভয় হয়।"

—"কোন ভয় নেই। আপনি খেতে বসুন।"

—"হুম্, আচ্ছা! দুটো খাবার মুখে দি তাহ'লে। কিন্তু কাল সকালেই যাচ্ছেন তো?"

—"হ্যাঁ।"

—"কত লোক নেবেন?"

—"আমরা পাঁচজন তো আছিই, আরো জন-বারো চৌকিদারও যাবে।"

—"জন-বারো? জন-চব্বিশ নেওয়া উচিত।"

—"তাহ'লে আরো দু-দিন অপেক্ষা করতে হয়। আপাতত অত লোক নেই।"

—"না, না, অপেক্ষা নয়—ঐ জন-বারোতেই হবে!"

আহারাদির পর আরো খানিকক্ষণ পরামর্শ চলল। তারপর রাত বারোটা বাজ্‌ল দেখে মহম্মদ উঠে দাঁড়ালেন।

ঠিক সেই সময়ে ফাঁড়ির দরজায় একখানা মোটর সশব্দে এসে দাঁড়াল।

মহম্মদ বিরক্ত স্বরে বললেন, "এত রাতে কে আবার 'কেস্' নিয়ে জ্বালাতে এল?"

"আঃ, বাঁচলুম !···হুম্!"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল—ছু-জনের পায়ের শব্দ।

সুন্দরবাবু তাঁর বিপুল ভুঁড়ির ভার ভুলে গিয়ে শূন্যে এক লাফ মারলেন। মহা উল্লাসে ব'লে উঠলেন, "ও পায়ের শব্দ আমি চিনি! জয়ন্ত আর মাণিক আসছে!"

তারাই বটে! গায়ে, কাপড়-চোপড়ে ধূলো আর কাদা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, কিন্তু মুখে প্রচণ্ড উৎসাহের ঔজ্জ্বল্য!

সুন্দরবাবু একসঙ্গে তাদের ছুজনকে চেপে ধ'রে বললেন, "আঃ, বাঁচলুম! কী ভাব্‌নাটাই না হয়েছিল! হুম্‌!"

মহম্মদ বললেন, "কোথায় ছিলেন আপনারা? আমরা যে কাল সকালেই আপনাদের খুঁজতে আলিনগরে যাচ্ছিলুম!"

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে বললে, "কাল সকালে? না, না, নবাবকে যদি ধরতে চান, আজ এখনি চলুন।"

—"তার মানে?"

—"নবাবের আড্ডা আমরা আবিষ্কার করেছি, মাণিকের ছুই গুলিতে তার ছুই পা খোঁড়া হয়ে গেছে, এমন-কি নবাবের হাতেও আমরা হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে এসেছি,—এখন দেরি করলে সে হয়তো স'রে পড়বে!"

মহম্মদ বললেন, "এতই যখন ক'রেছেন, তখন দয়া ক'রে নবাবকে ধ'রে আনলেন না কেন?"

—"ধ'রে আনলুম না কেন?"—ব'লেই জয়ন্ত থেমে গেল। তার চোখের সামনে ফুটে উঠল, প্রায়-অন্ধকার গৃহতলে শায়িত সেই ছয়টা মৃতদেহ! নিরালা, নীরব, নির্জ্জন অট্টালিকার ধাপে ধাপে সেই ধুপ্‌ ধুপ্‌ ধুপ্‌ ধুপ্‌ ক'রে জ্যান্তো মড়ার অলৌকিক পদশব্দ আবার যেন সে শুনতে

পেলে স্বকর্ণে!……থেমে থেমে বললে, "মহম্মদ-সাহেব, বলতে পারেন, মড়া কখনো বাঁচে?"

—"মড়া?"

—"হ্যাঁ, ছয়টা মড়া আমাদের আক্রমণ করতে এসেছি তাই নবাবকে আনতে পারিনি। পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।"

—"কী বলছেন!"

—"মাণিককে জিজ্ঞাসা করুন। আমি খালি পায়ের শব্দ শুনেছি, মাণিক স্বচক্ষে দেখেছে।"

অমিয়, নিশীথ ও পরেশ একসঙ্গে ব'লে উঠল, "আমরাও তাদের দেখেছি!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। আমার কথাই সত্যি হ'ল! কাঙালের কথা বাসি হ'লে টকে।"

মাণিক বললে, "আপনি কাঙাল নন সুন্দরবাবু, তিনশো টাকা মাইনে পান।"

সুন্দরবাবু রেগে বললেন, "ঠাট্টা কোরোনা মাণিক! এখন ঠাট্টা আমার ভালো লাগছে না!"

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, "এর ভিতরে নিশ্চয়ই কোন কারসাজি আছে। মড়া আক্রমণ করে? অসম্ভব!"

—"বেশ তো, এখনি দলবল নিয়ে চলুন না!"

—"তাও হয় না। যেতে হ'লে বড় বড় মোটর চাই। মোটর কাল সকালের আগে পাওয়া যাবে না।"

জয়ন্ত নাচার ভাবে বললে, "তাহ'লে কাল সকাল পর্য্যন্তই অপেক্ষা করি, কি আর করব?"

*   *   *   *

পরিত্যক্ত আলিনগরের প্রাচীন পথ ধ'রে দুখানা সাধারণ মোটর-গাড়ী ও একখানা মোটর-বাস অগ্রসর হচ্ছে। জয়ন্ত, মাণিক ও সুন্দরবাবু ছিলেন একখানা 'টু-সিটারে', জয়ন্ত নিজেই তার চালক। তার পরের গাড়ীতে আছেন মহম্মদ, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ! 'বাসে' আছে বারোজন চৌকিদার। ড্রাইভারদের নিয়ে মোট একুশজন লোক।

জয়ন্তের মতে একুশজন লোকই যথেষ্ট। সুন্দরবাবু খুৎ-খুৎ ক'রে বলেন, "মোটেই যথেষ্ট নয়। হানাবাড়ীতে একশোজন লোকও যথেষ্ট নয়। হুম্! একটা ভূত দেখা দিলে একশোজনের একজনেরও আর দেখা পাওয়া যাবে না। আর এখানে একটা নয়—ভূত আছে নাকি ছয়-ছয়টা! বাপ্রে!"

মাণিক বললে, "একশোজনেরও দেখা পাওয়া যাবে না? তাহ'লে আপনিও কি পালাবেন?"

—"পালাব না তো কি, নিশ্চয়ই পালাব! আমি হচ্ছি পুলিস, আমি ভূতের রোজা নই, ভূত দেখলে পালাব না তো কি দাঁড়িয়ে থাকব?"

—"তবে আপনি এলেন কেন?"

—"সেই ছয়টা লোক তো ভূত না হ'তেও পারে? হয়তো তোমাদের ছেলেমানুষ পেয়ে কেউ মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে! বিশেষ এটা দিন-দুপুর। কে না জানে, দিন-দুপুরে ভূত বড়-একটা দেখা দেয়না।"

মাণিক মুখে টিপে হেসে বললে, "কেন সুন্দরবাবু, আপনি কি প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য শোনেন নি?"

—"কি শাস্ত্রবাক্য?"

—"ঠিক দুপুর-বেলা, ভূতে মারে ঢেলা?"

—"হুম্। আবার ঠাট্টা হচ্ছে?"

গাড়ীগুলো গোরস্থানে এসে উপস্থিত হ'ল। জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে "এই-খানেই সকলকে নামতে হবে।"

সকলে একে একে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। একসঙ্গে এত লোকের ভীড় হতভাগ্য আলিনগর অনেককাল দেখে নি। পথের উপরে শুয়ে একটা গোখরো সাপ নিশ্চিন্ত মনে কুণ্ডলী পাকিয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল, সে তাড়াতাড়ি ফোঁশ্ ক'রে ফনা তুলে উঠেই কালো বিদ্যুতের মতন চকিতে একখানা পাথরের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে।

চারিদিকে তাকিয়ে মহম্মদ বললেন, "এমন জায়গা কখনো দেখি নি। নগর বললেই লোকের মনে জেগে ওঠে জনতার দৃশ্য। কিন্তু জনতাহীন নগর—জলশূন্য সাগর! চারিদিকে খালি ভাঙা বাড়ী আর ঘুঘুর কান্না! দিনের বেলাতেই এখানে বুকের কাছটা ছাঁৎ-ছাঁৎ ক'রে ওঠে! এখানে একলা এলে রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক!"

জয়ন্ত অল্প হেসে বললে, "আপনি বোধহয় ভাবছেন, আমরাও রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছি? কিন্তু এইটেই আপনার ভ্রম! এইপথে আসুন!"

গোরস্থানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে মহম্মদ বললেন, "কিন্তু একটা-কিছু গোলমাল আছেই আছে, আপনারা যা দেখেছেন তা ভূতের চেয়েও আশ্চর্য্য! জ্যান্তো মড়ার কল্পনাও আমি করতে পারছি না!"

মাণিক বললে, "তারা যদি এখনো এখানে থাকে, তাহ'লে আপনিও স্বচক্ষে দেখতে পাবেন!"

জয়ন্ত বললে, "অনেক সময় বাজে নষ্ট হয়েছে। তারা কি আর এখানে আছে?"

সেই বিশাল অট্টালিকার বিবর্ণ উচ্চ চূড়া চতুর্দ্দিকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে

অনেক দূর থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সকলে সেই বাড়ীর যত কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, সুন্দরবাবু একটু-একটু ক'রে ততই পিছিয়ে পড়ছেন! ক্রমে তিনি চৌকিদারদের দলে গিয়ে ভিড়লেন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, পিছিয়ে থাকলে ভূতের আবির্ভাব হ'লে সর্ব্বাগ্রে তিনিই দৌড় মারতে পারবেন!

মহম্মদ বললেন, "অত-বড় বাড়ী ঘেরাও করতে গেলে একশো জন লোকের দরকার।"

জয়ন্ত বললে, "বাড়ী ঘেরাও ক'রে যখন কোন লাভ নেই, তখন ভিতরের উঠানে চৌকিদাররা অপেক্ষা করুক্। আমরা ডাকলেই তারা যেন ছুটে আসে।"

সুন্দরবাবু মনে মনে বললেন, "তারাই ছুটে আসবে বটে! ছুটে আসবে, না ছুটে পালাবে? ভূতের সঙ্গে লড়বে এই তালপাতার সেপাইরা! হুম্!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হুম্ হুম্ হুম্ হুম্

সকলে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলে। এতগুলো জুতোর শব্দে অট্টালিকাবাসী নির্জ্জনতা যেন চম্‌কে উঠল সবিস্ময়ে!

জয়ন্ত মনে মনে ভাবলে, নবাব যদি এখনো এখানে থাকে, তাহ'লে এ পায়ের শব্দগুলো সেও শুনতে পেয়েছে নিশ্চয়ই!

আর সেই জ্যান্তো মড়াগুলো! তারাও কি এখন উৎকর্ণ হয়ে তালে তালে পা ফেলে আক্রমণ করতে আসবার জন্যে অপেক্ষা করছে না?

সুন্দরবাবু মনে মনে ভাবছেন, এবারে তো খাঁচার ভিতরে ইঁদুরের মত বাড়ীর ভিতরে বন্দী হলুম। কোন্‌দিক দিয়ে ভূত এলে কোন্‌দিক দিয়ে পালানো উচিত, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না! আর চৌকিদারদেরও সঙ্গে থেকে লাভ হবে না, এদের হাতে বন্দুক নেই!"·········তিনি দৌড়ে মহম্মদের সঙ্গ নিলেন।

জয়ন্ত সর্ব্বাগ্রে একতালা দালানের সেই কোণের ঘরে গিয়ে ঢুকল। চারিদিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে হতাশ ভাবে বললে, "তারা এখানে নেই।"

সুন্দরবাবু আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।—"তারা নেই, বাঁচা গেছে! আপদ বিদেয় হয়েছে!"

মহম্মদ বললেন, "আপনি ঘর ভুল করেন নি তো?"

জয়ন্ত বললে, "না। ঐ দেখুন!" ব'লেই সে 'টর্চ্চ' টিপে মেঝের

উপরে আলো ফেললে। মেঝের উপরে পুরু ধূলো। আর ধূলোর উপরে পাশাপাশি ছয়টা দেহের পরিষ্কার ছাপ্।

মাণিক বললে, "এ-ঘরে মড়াগুলো ছিল ঠিক মড়ারই মত। তাদের গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি, নাকে হাত দিয়ে দেখেছি।"

মহম্মদ খালি বললেন, "আশ্চর্য্য!"

সুন্দরবাবু সকলের পিছন থেকে উঁকি মেরে দেহের ছাপগুলো একবার দেখেই শিউরে উঠে বললেন, "হুম্! আমার নাকে পচা মড়ার গন্ধ আসছে!"

মাণিক বললে, "সত্যি-সত্যিই সেদিন এখানে মড়া-পচা গন্ধ ছিল।"

মহম্মদ বললেন, "সুন্দরবাবুর ঘ্রাণ-শক্তি বেশী। আমি কোন গন্ধ পাচ্ছি না।"

জয়ন্ত বললে, "চৌকিদারদের উঠোনের সব ঘর খুঁজে দেখতে বলুন। ততক্ষণে আমরা উপরটা ঘুরে আসি। কিন্তু বোধহয় মিথ্যা ঘোরাঘুরি। শিকার পালিয়েছে। আমরা যে আবার আসব নবাব সেটা আন্দাজ করতে পেরেছে। সে বোকা নয়।"

দোতালার দালানের কোণে শুয়েছিল সেই কালো বিড়ালটা। লোক দেখেই 'ম্যাও' ব'লে আপত্তি জানিয়ে ল্যাজ তুলে দৌড় মারলে।

মহম্মদ বললেন, "হানাবাড়ীর সব লক্ষণই এখানে আছে দেখছি।"

মাণিক বললে, "হ্যাঁ, কেবল কালো বিড়াল নয়, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দলে দলে কালো বাদুড়ও ঝুলছে! যেন আঁধারে-তৈরি অতিকায় প্রজাপতি!"

—"কেবল আসল দ্রষ্টব্যই নেই। ভূত, কি জ্যান্তো মড়া!"

সুন্দরবাবু বললেন, "ভূত আবার দ্রষ্টব্য কি, না থাকাই তো ভালো!"

যে-ঘরে নবাব আহত হয়েছিল সকলে সেই ঘরে প্রবেশ করলে। ঘরে জনপ্রাণী নেই।

মেঝের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। যেন নিশ্চল জড় পাথরের মূর্ত্তি! তারপর হঠাৎ কি উৎসাহে তার বিপুল বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠল! তারপর পকেট থেকে রূপোর শামুক বার ক'রে ত্বার সশব্দে নস্য নিলে।

মাণিক জানে, এটা জয়ন্তের বিশেষ আনন্দের লক্ষণ। কিন্তু হঠাৎ সে এমন আনন্দিত হ'ল কেন?

মহম্মদ বললেন, "বাড়ীর সব ঘরই যে এমনি খালি দেখব, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

জয়ন্ত খুসি-গলায় বললে, "সব ঘর হয়তো খালি নেই।"

—"কি ক'রে জানলেন?"

—"এখনো ঠিক ক'রে কিছু বলতে পারছি না। আসুন আমার সঙ্গে।"

জয়ন্ত অগ্রসর হ'ল। আর সবাই চলল তার পিছনে পিছনে।

সে-ঘর থেকে বেরিয়ে জয়ন্ত খুব ধীরে ধীরে দালান দিয়ে এগুতে লাগল দালানের পূর্ব্বপ্রান্তে একটা দরজা। সেটা ভিতর থেকে বন্ধ।

মহম্মদ বললেন, "এ দরজা বন্ধ করলে কে?"

জয়ন্ত বললে, "যেইই বন্ধ করুক্, আমি খুলে দিচ্ছি। আপনাদের বন্দুক তৈরি রাখুন।"

তার বিপুল দেহের ধাক্কায় দরজার খিল ভেঙে গেল।

কিন্তু সেটা ঘরের দরজা নয়। অন্দর-মহলের দরজা।

জয়ন্ত আবার অগ্রসর হ'ল। অন্দরেও একটা উঠান রয়েছে, কিন্তু বাইরের মতন অত-বড় নয়। আবার একটা দালান। তারপর আবার একসার সিঁড়ি। জয়ন্ত এবার নীচে নামতে লাগল। তারপর ডানদিকে ফিরে এগিয়ে চলল। সে আবার একটিপ্ নস্য নিলে। এবং মনের আমোদে শিস্ দিতে সুরু করলে!

মাণিক অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, জয়ন্ত কোথায় যাচ্ছে? এ বাড়ীর কিছুই সে চেনেনা, এদিকে কখনো আসেও নি, কিন্তু এমন নিশ্চিতভাবে কোথায় যাচ্ছে সে? জয়ন্ত তো অকারণে কিছু করবার পাত্র নয়, কী সূত্র সে পেয়েছে—কখন্ পেলে এবং কেমন ক'রে পেলে?

দ্বিতীয় উঠানের পূর্ব্বপ্রান্তে ঘুট্ঘুটে অন্ধকার একটা ঘর। জয়ন্ত সোজা সেই ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুক্ল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার 'টর্চ্চ্'টা জ্বলে কি যেন দেখলে!

সে ঘরেও কেউ নেই।

মহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে এলেন কেন?"

জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে যেন নিজের মনেই বল্লে, "দেখছি, এ ঘর দিয়ে বেরুবার আর কোন পথ নেই। তাহ'লে নবাব কোথায় গেল?"

—"কে কোথায় গেল?"

—"নবাব। সে এই ঘরেই ঢুকেছে। কিন্তু দরজা দিয়ে আর বেরোয় নি।"

মহম্মদ একটু বিরক্ত স্বরেই বললেন, "আপনার এমন আশ্চর্য্য অনুমানের কারণ কি?"

—"কারণ? রক্তের প্রমাণ মহম্মদ-সায়েব, রক্তের প্রমাণ! আপনারা চোখ ব্যবহার করতে শেখেন নি কেন?"

—"আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না!"

—"মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখুন!"

মাণিক সবিস্ময়ে দেখলে, গৃহতলে একটা সুদীর্ঘ কালো রেখা! ঘর থেকে মুখ বাড়িয়েও দেখলে, সে-রেখা দালান দিয়ে সমান চ'লে গেছে! রক্ত জমাট্ বাঁধলে কালো দেখায়। এত-বড় একটা সূত্রও তার চোখে পড়েনি ব'লে সে রীতিমত লজ্জা অনুভব করলে!

জয়ন্ত বললে, "মহম্মদ-সায়েব, শুনেছেন তো, মাণিকের রিভলভারের গুলিতে কাল নবাবের উরু আর পা জখম হয়েছিল? নবাব যেখান দিয়ে গিয়েছে, কিংবা তাকে যেখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সারা পথেই রক্ত ঝ'রে ঝ'রে পড়েছে! সেই রক্তরেখা অনুসরণ করেই উপরের ঘর থেকে আমি এখানে এসে হাজির হয়েছি। এখন বুঝতে পারলেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! জয়, তুমি আমার কাণ ম'লে দাও! আমরা কি চোখের মাথা খেয়েছিলুম? এমন সহজ প্রমাণটাও আবিষ্কার করতে পারি নি!"

মহম্মদ চমৎকৃত স্বরে বললেন, "ধন্য জয়ন্তবাবু, ধন্য!......কিন্তু সে সয়তানটা গেল কোথায়?"

—"সেইটেই হচ্ছে সমস্যা। দেখছেন তো, রক্তের একটা রেখাই এই ঘরে এসে ঢুকেছে। নবাব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আর একটা রেখাও দেখতে পাওয়া যেত। মহম্মদ-সায়েব, আপনি সব চৌকিদারকে এখানে আসতে বলুন, আমি ততক্ষণ নবাবকে পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করি।"

মহম্মদ বাইরে গিয়ে বার-তিনেক বাঁশী বাজাতেই চৌকিদারদের দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত 'টর্চ্চ' জ্বেলে দেখে বললে, "মাণিক, রক্তের দাগ ঐ দেয়ালের গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু দেয়ালের সামনে গিয়ে নবাব অদৃশ্য হ'ল কেমন ক'রে, সে তো আর হাওয়ায় হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে না?… হয়েছে! ঐ দেখ, দেয়ালের গায়ে হুটো কড়া! এ-সব সেকেলে পুরাণো বাড়ীতে প্রায়ই গুপ্তদ্বার থাকে। মাণিক, কড়াহুটো ধ'রে জোরে টান মারো তো!"

মাণিক তাই করলে। খুব সহজেই দেয়ালের খানিকটা অংশ হড়্ হড়্ ক'রে দরজার মত খুলে এল! ভিতরে একটা পথ!

জয়ন্ত বললে, "সবাই রিভলভার নাও। ছয়জন চৌকিদার গুপ্তদ্বারের সামনে পাহারা দিক্। ছয়জন আমাদের সঙ্গে আসুক্।"

পথটা গিয়ে আর একটা দরজার সাম্‌নে শেষ হয়েছে। দরজার সঙ্গে আর একবার জয়ন্তের শক্তি-পরীক্ষা সুরু হ'ল। কিন্তু এ দরজা জয়ন্তের প্রবল আক্রমণ তিন-তিনবার ব্যর্থ করলে!

জয়ন্ত তখন দরজার উপরে পৃষ্ঠদেশ রেখে দেহের সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ ক'রে প্রাণপণে চাপ্ দিতে লাগল,—'টর্চ্চে'র আলোতে দেখা গেল, তার সারা মুখ রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে!

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, "অসম্ভব চেষ্টা! মানুষ ও-দরজা গায়ের জোরে ভাঙতে পারে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।"

হঠাৎ মড়াৎ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। জয়ন্ত স'রে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "দেখুন, ভেঙেছে কিনা?"

মহম্মদ এগিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, দরজার হুখানা কবাটই চৌকাঠ থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। সসম্ভ্রমে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আপনি অসাধারণ মানুষ!"

তারপর দু-তিনটে লাথি মারতেই হুড়মুড় ক'রে পাল্লা-দুখানা ভেঙে পড়ল!

খোলা দরজা দিয়েই দেখা গেল, একখানা বড় হলঘর। এবং ঘরের ওদিককার দেয়ালের সামনে খাটের বিছানার উপরে হাসিমুখে ব'সে রয়েছে, নবাব স্বয়ং!

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, "সেলাম আলিনগরের সম্রাট! ঘরের ভিতরে যেতে পারি কি?"

নবাব খুব মিষ্ট-গলায় বললে, "এস।"

—"তোমার সেই জীবনহীন জীবন্তরা কোথায়?"

নবাব আবার ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে বললে, "বড়-হঠাৎ এসে পড়েছ, তাদের জাগাবার আর সময় পেলুম না!"

—"তাহ'লে এ-জীবনে আর সময় পাবেও না!"—ব'লেই জয়ন্ত ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল সর্ব্বপ্রথমে। অন্য সবাই তার পিছনে পিছনে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ সুন্দরবাবু "ওরে বাপ্‌রে—হুম্!" ব'লে চেঁচিয়ে উঠে সামনে অমিয়কে পেয়েই দুইহাতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলেন!

সকলে ফিরে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, দরজার দিকের দেয়ালের তলাতেই পাশাপাশি শুয়ে আছে সেই ছয়টা মূর্ত্তি! তাদের কারুর চোখ মোদা, কারুর চোখ আধা-খোলা, কারুর চোখ পুরো খোলা! কিন্তু সব চোখই আড়ষ্ট—মড়ার মত দৃষ্টিহীন!

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে তাদের বুকে হাত দিয়ে বললে, "মহম্মদ-সায়েব, দেখে যান—এই ঠাণ্ডা বুকে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন চিহ্ন আছে কিনা?"

কিন্তু মহম্মদের রুচি হ'ল না। দূর থেকেই বললেন, "দেখতেই তো পাচ্ছি, ওগুলো মড়া!"

মাণিক বললে, "কিন্তু এই মড়াগুলোই সেদিন বেঁচে উঠেছিল!"

মহম্মদ অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন।

সুন্দরবাবু চোখ ছানাবড়া ক'রে বললেন, "ওরা আবার যদি জাগে? আবার যদি তেড়ে আসে? এই চৌকিদার! লাসগুলো শীগ্‌গির এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা!"

কিন্তু চৌকিদাররা কেউ মড়া ছুঁতে রাজি হ'ল না।

নবাব হাসতে হাসতে বললে, "ভয় নেই, ওরা কেউ আর জাগবে না। এইবারে আমিও ওদের মত ঘুমিয়ে পড়ব।"

জয়ন্ত চম্‌কে উঠে বললে, "ঘুমিয়ে পড়বে—মানে?"

—"হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়ব। তোমরা জ্যান্তো নবাবকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। এই দেখ!" নবাব বিছানাব উপর থেকে একটা খালি শিশি তুলে নিয়ে দেখালে।

—"তুমি বিষ খেয়েছ?"

—"হ্যাঁ। তোমরা হঠাৎ এসে পড়লে, নইলে ওদের আর-একবার জাগিয়ে শেষ-চেষ্টা ক'রে দেখতুম! বিষ না খেয়ে উপায় কি?"

মহম্মদ বললেন, "তুমি সত্যি-সত্যিই ঐ মড়াগুলোকে বাঁচাতে পারো?"

—"পারি। অবিশ্বাস হচ্ছে? দেখবে?"

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে তাড়াতাড়ি বললেন, "না না, আর দেখে কাজ নেই! আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে।"

নবাব বললে, "তোমরা কি পিশাচসিদ্ধ মানুষের কথা শোনো নি? আমি

বহু সাধনায় সেই বিদ্যা অর্জ্জন করেছি। নানান্ দেশের নানান্ কবর খুঁজে আমি বেছে বেছে খুব জোয়ান্ আর টাট্কা মড়া তুলে এনেছি। যখন দরকার হয় তখন আমি তাদের নিজের আত্মার অংশ দি। কিন্তু ওদেরও দেহ তাজা রাখ্বার জন্যে জ্যান্তো জীবের রক্তের দরকার হয়। তাই যখন ঐ মড়ারা বাঁচে, বনের জীব-জন্তু ধ'রে তাদের ঘাড় ভেঙে রক্ত খায়, সুবিধা পেলে মানুষের রক্তও পান করে; আর তারপর গোলামের মত আমার হুকুমে ওঠে-বসে চলে-ফেরে!······তোমরা আর কি জানতে চাও বল, আমার ঘুমোবার সময় ঘনিয়ে আসছে!"

জয়ন্ত বললে, "তুমি মেয়ে চুরি করতে কেন?"

হা-হা ক'রে হেসে নবাব বললে, "কেন? বলেছি তো, আমি আলি-নগরের রাজা! তাই তো আমি নবাব নাম নিয়েছি! আমার বেগম নেই, তাই মেয়ে ধ'রে আনি বেগম করব ব'লে। কিন্তু একটা মেয়েও আমার বেগম হবার উপযুক্ত হ'ল না! তবু তাদের ধ'রে রেখেছি,—মনের মত বেগম পেলে পর তাদের বাঁদী ক'রে রাখব ব'লে!"

অমিয় ব্যাকুল কণ্ঠে ব'লে উঠল, "কোথায় আমার বোনকে লুকিয়ে রেখেছিস্?"

—"পাশের ঘরে গিয়ে দেখ-গে!"

অমিয়, নিশীথ ও পরেশ একসঙ্গে ব'লে উঠল, "কোন্‌দিক দিয়ে যাব?"

—"ঐ দরজা দিয়ে!"

পশ্চিম দিকে একটা দরজা। সেটা ঠেলতেই খুলে গেল, সেদিকেও একটা পথ রয়েছে।

তারা তিনজনে ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকলে—"শীলা! শীলা! শীলা!"

কে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে সাড়া দিলে, "দাদা, দাদা।"

মিনিট-তিনেক পরেই অমিয় তার বোনের হাত ধ'রে ফিরে এল। নিশীথ ও পরেশের পিছনে পিছনে এল আরো তিনটি মেয়ে, সকলেই ভয়ে থর্-থর্ ক'রে কাঁপছে!

ছয়টা মৃত মূর্ত্তির দিকে তাকিয়েই শীলা আর্ত্তনাদ ক'রে আতঙ্কগ্রস্ত স্বরে ব'লে উঠল, "দাদা, দাদা, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল!"

অমিয় বললে, "আমরা এসে পড়েছি, আর তোর ভয় কি শীলা?"

শীলা ভয়ে চোখ মুদে শুক্‌নো গলায় বললে, "কিন্তু ঐ মড়াগুলো? ওরা যে এখানে রয়েছে! ওরাই যে আমাকে ধ'রে এনেছে! ওরা যে রোজ আমাকে ভয় দেখায়!"

শীলাকে নিজের আরো-কাছে টেনে এনে তার পিঠ চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে অমিয় বললে, "ওরা আর কারুকে ভয় দেখাতে পারবে না। ওদের আবার আমরা মাটির তলায় পুঁতে ফেল্‌ব।"

নবাব গম্ভীর স্বরে বললে, "তোমাদের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে তো? এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাও দেখি! আমাকে একলা মরতে দাও!"

মহম্মদ বললেন, "তা হয় না। তুমি মরবে কি না কে জানে?"

নবাব ট'লে প'ড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দেয়াল ধ'রে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বললে, "আমার মৃত্যু নিশ্চিত। তোমরা নির্ভয়ে যেতে পারো।"

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, "চোখের সামনে তোমার মৃত্যু না দে' আমরা এখান থেকে এক পা নড়তে পারব না।"

"মাণিক রিভলভার ছুঁড়লে"

নবাবের ঝিমিয়ে-আসা চোখে আবার বিদ্যুৎ খেলে গেল। অস্পষ্ট, জড়ানো স্বরে সে গর্জ্জন ক'রে বললে, "কী, আমাকে একলা মরতে দেবে না? বটে!" হঠাৎ সে সিধে হয়ে উঠল এবং—তার দুই চোখ বন্ধ হয়ে গেল!

মাণিক সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "ও মরল নাকি?"

জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নবাবের মুখের পানে চেয়ে রইল।

আচম্বিতে সুন্দরবাবু মেঝের উপরে প্রচণ্ড এক ঝাঁপ্ খেয়ে আছ্ড়ে পড়লেন এবং বেগে গড়াতে গড়াতে নবাবের খাটের তলায় ঢুকে প'ড়ে ক্রমাগত বলতে লাগলেন, "হুম্, হুম্, হুম্, হুম্!"

ওদিকে ঘরের ভিতরে আরম্ভ হয়েছে চীৎকার ও আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিষম হুটোপুটি ও ছুটোছুটি! চৌকিদাররা দল বেঁধে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে গেল অন্য-তিনটি মেয়ে,—কেবল শীলা তার দাদার দুই বাহুর উপরে এলিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল!

সেই ছয়টা মৃতদেহ টল্‌তে টল্‌তে মেঝের উপরে উঠে বসেছে—তাদের প্রত্যেকেরই ভাবহীন চক্ষু একেবারেই বিস্ফারিত!

মহম্মদ পিছনে হ'টে দেয়ালের উপরে পিঠ রেখে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন!

মাণিক উপর-উপরি রিভলভার ছুঁড়লে, কোন কোন দেহে গুলি ঢুকে বীভৎস ছিদ্রের সৃষ্টি করলে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এক ফোঁটাও রক্ত বেরুলো না, কিংবা মূর্ত্তিগুলোর মুখে-চোখে যন্ত্রণার আভাসটুকুও ফুটে উঠল না! ভয়ানক! সে অসম্ভব, অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখলেও বুকের রক্ত জ'মে বরফ হয়ে যায়!

জয়ন্তের হঠাৎ তখন খেয়াল হ'ল, নবাব নিশ্চয় মরবার আগে শেষ-বার মড়া জাগাবার জন্যে ধ্যানাসনে বসেছে! সে এক লাফে বিছানার উপরে গিয়ে প'ড়ে নবাবকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে! নবাব তীব্র কণ্ঠে "আঃ" ব'লে শয্যায় এলিয়ে পড়ল!

—ওদিকে সেই মুহূর্ত্তেই ছয়টা মূর্ত্তিই উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আবার অবশ হয়ে প্রথমে ব'সে—তারপর মাটিতে গড়িয়ে প'ড়ে গেল! আবার তারা যে-মড়া সেই-মড়া!

জয়ন্ত হেঁট হয়ে নবাবের বুকে হাত দিলে। তার বুক স্থির। তার নাকে হাত দিলে। নিঃশ্বাস পড়ছে না।

মাণিক খাটের তলা থেকে সুন্দরবাবুর দেহ টেনে বার করলে। তিনি তখন আর "হুম্" বলছেন না। অজ্ঞান।

ইতি

বাংলা সাহিত্যে 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'-কাহিনীর স্রষ্টা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত

ছোটদের গ্রন্থাবলী

যকের ধন (৩য় সংস্করণ) ... ১৲
মায়াকানন ... ... ১।০
মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন ... ১৲
আবার যকের ধন (৩য় সংস্করণ) ১৲
অমানুষিক মানুষ
(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)... ১৲
হিমালয়ের ভয়ঙ্কর (২য় সংস্করণ) ১৲
জয়ন্তের কীর্ত্তি ... ... ১৲
অসম্ভবের দেশে ... ... ১৲
রক্তবাদল ঝরে ... ... ১৲
পদ্মরাগ বুদ্ধ ... ... ১৲
অমাবস্যার রাত ... ... ১৲
মানুষ-পিশাচ ৸০
মানুষের গন্ধ পাই ... ... ১৲
রাত্রে যারা ভয় দেখায়
(ভূতের গল্প) ৸০

যাদের নামে সবাই ভয় পায়
(ভূতের গল্প, ২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) ৸০
সন্ধ্যের পর, সাবধান (ভূতের গল্প) ৸০
কিং কং (৩য় সংস্করণ) ... ১৲
মানব-দানব
(Dr. Jekyll and Mr. Hyde) ১৲
অদৃশ্য মানুষ
(The Invisible Man) ১৲
আজব দেশে অমলা (Alice in Wonderland, পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ) ॥০
সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র (জীবনী) ... ৸০
ছুটির ঘণ্টা (নিঃশেষিত)
নীলসায়রের অচিন-পুরে (যন্ত্রস্থ)
বিমল ও কুমারের কীর্ত্তিকাহিনী (ঐ)
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন (ঐ)